মেনে নেন, তাহলে আইন অমান্যের প্রয়োজন হবে না। এই দাবির মধ্যে কয়েকটি হলো— টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হার, পরিবর্তন, সংর(ণ, খাজনা হার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস, লবণ কর লোপ, রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি(ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবির মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ, এমনকি ডোমিনিয়ন স্টেটাসেরও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সরকার এই দাবি অগ্রাহ্য করেন। এই অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলন শু(করার সব দায়িত্ব গান্ধীজীর হাতে অর্পণ করে। আন্দোলন শু(করার পূর্বে গান্ধীজী সরকারকে আরও একবার সতর্ক করে দেন। কিন্তু সরকার প(এর প্রতিত্রি(য়া দেখা না দেওয়ায় আইন অমান্য আন্দোলন শু(হয়।

৩.১২ লবণ সত্যাগ্রহ ও গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান

গান্ধীজী বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন যে, ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি আন্দোলন শু(করবেন। লবণ সত্যাগ্রহ হল গান্ধীজীর প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন। অহিংসভাবে শত্রুকে চারদিক থেকে পর্যুদস্ত করাই ছিল লবণ সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা। লবণ আইন ভঙ্গ ছিল একটি প্রতীকী আন্দোলন। ১২ই মার্চ গান্ধী তাঁর ৭৮ জন ঘনিষ্ঠ সহচর নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা শু(করেন। উদ্দেশ্য ছিল খোলাখুলিভাবে আইন ভঙ্গ করে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করা। লবণ প্রস্তুতের ব্যাপারে সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই কারণে চড়া মূল্যে ভারতবাসীকে লবণ ত্র(য় করতে হত। চব্বিশ দিনে ২৪১ মাইল পথ অতিত্র(ম করে গান্ধীজী গুজরাটের সমুদ্রোপকূলে ডাণ্ডি নামক স্থানে উপস্থিত হন। পথের সর্বত্র পল্লীবাসীরা সত্যাগ্রহীদের বিপুল সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানায়। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী সমুদ্রের জল তুলে লবণ তৈরি শু(করেন। এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম পর্ব শু(হয়।

গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের মধ্যে একটা নাটকীয়তা ছিল Modern Review পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে যুগান্তকারী ও পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন। লুই ফিশার ডাণ্ডি অভিযানের মধ্যে প্রত্য(করেছেন গান্ধীর কল্পনা শক্তি(, মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি(ত্ব ও সবার উপরে একজন মহৎ শিল্পীর নৈপুণ্য।

দেশের নেতৃবৃন্দ সমুদ্র তীরে নানা স্থানে সমবেত হয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার মহিষবাথান এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কয়েকটি স্থানে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চলতে থাকে এবং সমগ্র প্রদেশের সত্যাগ্রহীরা এই সকল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। যে সকল স্থানে লবণ তৈরি করার সুবিধা ছিল না, সেইসব স্থানেও আন্দোলন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা-সমিতির চেষ্টা এবং আবগারী দোকানে পিকেটিং করা হয়। বিলাতী কাপড়ের দোকানে ও আবগারী দোকানে পিকেটিং করার ভার গান্ধীজী নারীদের ওপর অর্পণ করেন। 'বয়কট' আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে।

আইন অমান্য ও বয়কট আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সরকারের দমন নীতিও কঠোর হয়ে ওঠে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালায়। জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষিত হয় এবং প্রাদেশিক কমিটির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

৩.১৩ সরকারি লবণ গোলা আত্র(মণ

গান্ধী সরকারি ডিপো ধারসানায় সত্যাগ্রহ করে লবণ আইন ভাঙতে চেষ্টা করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন

আম্বাসতায়েবজী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে সরোজিনী নাইডু ধারসানায় লবণ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেন। তাঁর আন্দোলনের কাহিনী ওয়েব স্মিলার নামে জনৈক মার্কিন সাংবাদিক বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে সত্যাগ্রহীরা ধারসানার লবণ গোলার দিকে অগ্রসর হলে ইংরাজ ও ভারতীয় পুলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনুসারে ধারসানা ও ওয়াডালা নামক স্থানে সত্যাগ্রহ পূর্ণোদ্যমে চলতে তাকে। সেই সঙ্গে সরকার অত্যাচার ও উগ্রমূর্তি ধারণ করে।

৩.১৪ সরকারের দমন নীতি ও ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে গণআন্দোলন

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরে হরতাল পালন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে বি(োভ সমাবেশ হয়। তবে সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। বোম্বাইতে এই আন্দোলনে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বোম্বাই ছাড়া বাংলা, মাদ্রাজ ও যুক্ত(প্রদেশেও লবণ সত্যাগ্রহ যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলায় লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন শু(হয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় ৪০টি গ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ শু(হয়। যুক্ত(প্রদেশ ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের একটি বড়ো ঘাঁটি। দ(িণ ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন বোম্বাই, গুজরাট বা মেদিনীপুরের মত তীব্র আকার ধারণ করেনি। আইন অমান্য আসামে উল্লেখযোগ্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, পাঞ্জাবেও আইন অমান্য আন্দোলন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

৩.১৫ বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পর বাংলাতেই আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মেদিনীপুর জেলায় লবণ সত্যাগ্রহের পরই সরকারি কর্মচারী বয়কট, চৌকিদার ও পুলিশের উপর আত্র(মণ চলেছিল। মেদিনীপুরে আন্দোলন সর্বত্র গান্ধীবাদী পথে পরিচালিত হয়নি। মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আইন অমান্য ব্যাপক সাড়া জাগালেও এই আন্দোলন বাংলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কলকাতায় বয়কট ও বি(োভ প্রদর্শন ছিল এই আন্দোলনের অপরিহার্য আন্দোলন।

৩.১৬ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আন্দোলন

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খ্যাতনামা অহিংসাবাদী নেতা খান আবদুল গফর খাঁ-এর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। তাঁর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি করার চেষ্টা ল(্য করা যায়। আন্দোলন দমন করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়।

৩.১৭ আইন অমান্য ও কৃষক বিদ্রোহ

আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'খাজনা বন্ধ আন্দোলন' এই আন্দোলনগুলির কারণ হলেও, প্রকৃতপ(এর মূলে ছিল কৃষকদের উপর জমিদারদের শোষণ। এলাহাবাদে 'খাজনা বন্ধ আন্দোলন' শু(হলে সেই সুযোগে সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের প্রসারের ল(্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসে যোগদান করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সংঘটিত কৃষক আন্দোলন সরকার কঠোর হাতে দমন করেন।

গান্ধীজীর আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলন ছিল বহুমুখী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে তেজবাহাদুর সপ্রু ও জয়াকার কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

৩.১৮ প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ও গান্ধী আরউইন চুক্তি((১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ)

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতের সব রাজনৈতিক দল রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি গ্রহণে অসম্মত হন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কংগ্রেস ভিন্ন অপর রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড কতকগুলি সাংবিধানিক প্রস্তাব দেন। ভারতে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব।

ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবে সম্মত হলেও মুসলমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িকভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। তপশিলী সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ডক্টর আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন।

ব্রিটিশ সরকার কেন গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেছিলেন, তার একটি কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বি. আর. টমসন বলেছেন যে, সরকারের ইচ্ছা ছিল নতুন সংবিধান কার্যকরী করার আগেই ভারতের বিভিন্ন নেতা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের অভিমত গ্রহণ করা। কংগ্রেসের অনুপস্থিতি সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছিল। গোলটেবিল ব্যর্থ হওয়ায় সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে আসতে চাইলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আশা করেছিলেন যে, পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করবে। মহাত্মাজী-সহ সকল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে মুক্তি(দেওয়া হয়। গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষপর্যন্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি(সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি(র মাধ্যমে সরকার অত্যাচারমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি(অনুমোদনের জন্য ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং গান্ধীজীর উপস্থিতিতে চুক্তি(অনুমোদিত হলে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সুনিশ্চিত হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩১) ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শু(হওয়ার পূর্বেই ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব কঠোর হয়। এই বৈঠকে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সজ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বৈঠকের সভাপতিত্ব করলেও ইংল্যান্ডের র(ণশীল সরকারের নীতি বৈঠকের আলোচনাকে প্রভাবিত করে।

ভারতের নব নিযুক্ত(বড়লাট ওয়েলিংডন গান্ধী-আরউইন চুক্তি(সমর্থন করেননি। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল যুক্ত(রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা। গান্ধীজী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উপর জোর দিলেও ব্রিটিশ সরকার তার চেয়েও বেশি গু(ত্ব দিলেন সংখ্যালঘু সমস্যার উপর। গান্ধীজী শত চেষ্টা করেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন এবং হতাশ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

৩.১৯ আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী দেশে ফিরে এসে এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। সে সময় সরকার গান্ধী-আরউইন চুক্তি(র শর্তাদি পালন করার পরিবের্ত তা নাকচ করতেই বেশী উৎসাহী হন। বাংলা, যুক্ত(প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা জারী করে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হয়। এই অবস্থায় গান্ধীজী বড়লাট ওয়েলিংডনের সঙ্গে আলোচনা শু(করেন। কিন্তু সরকার প(র কঠোর মনোভাবে গান্ধীজী হতাশ হন এবং কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শু(করতে বাধ্য হয়।

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলে সরকারের প্রতিত্রি(য়াও শু(হয়। গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেইসঙ্গে দেশের উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসী নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। একাধিক জ(রী আইন চালু করে আন্দোলন দমন করার ও সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করা হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করে। এর দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত অনুন্নত সম্প্রদায়কেও পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়ায় গান্ধীজী অনশন শু(করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকর এই ব্যাপারে হস্ত(প করে গান্ধীজীর সঙ্গে পুণা চুক্তি(তে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি(অনুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করার বিনিময়ে ডক্টর আম্বেদকর হিন্দুদের যৌথ ভোট দেওয়ার নীতি স্বীকার করে নেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে বিনা শর্তে মুক্ত(করেন।

এরপর গান্ধীজী প্রায় দু'বছর হরিজন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে অস্পৃশ্যতার বি(দ্ধে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসলেও কংগ্রেস এতে যোগদান না করায় এই বৈঠকের একপ্রকার কোন গু(ত্ব ছিল না। এই বৈঠকেই ভারত শাসন বিল নিয়ে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।

৩.২০ আইন অমান্য আন্দোলনের মূল্যায়ন

অসহযোগ আন্দোলনের মত আইন অমান্য আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন ল(্য ও ব্যাপ্তি—উভয় দিক থেকে ছিল অনেক অগ্রণী ও পরিণত। আইন অমান্য আন্দোলনের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক হলো মহিলাদের অংশগ্রহণ। গান্ধীজী নিজে মহিলাদের এই আন্দোলনে সত্রি(য়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। শিল্পপতি থেকে শু(করে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চেহারা

দেখে ব্রিটিশ সরকার চমকে উঠেছিলেন। এই আন্দোলনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় দিক হলো গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন।

লবণ সত্যাগ্রহের তথা আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নরমপন্থী উগ্রপন্থী, মুসলিম লীগপন্থী, হিন্দু-মহাসভাপন্থী প্রায় সকল পন্থীর জনগণ ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আইন অমান্য আন্দোলন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেও এর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কেও কিছু কথা বলা আবশ্যক। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি কারণ হল ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য। এছাড়া দলীয় সংগঠনের ওপর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণিও অসহযোগ আন্দোলনে যেভাবে উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করেছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তা করেনি। আইনজীবী ও ছাত্র সম্প্রদায় তাদের আগেকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল।

আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আইন অমান্য আন্দোলনের তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

৩.২১ অনুশীলনী

(ক) খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল? এই আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা কর।

(খ) অসহযোগ অন্দোলনের পটভূমি কি ছিল? এই আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা কর।

(গ) অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রকৃতি আলোচনা কর।

(ঙ) আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি আলোচনা কর।

(চ) আইন অমান্য আন্দোলন কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথকে ত্বরান্বিত করেছিল?

৩.২২ গ্রন্থপঞ্জী

১। অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)।

২। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে. পি. বাগচি এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।

৩। Judith Brown, **Gandhi and Ciil Disobedience : The Mahatma in Indian Politics 1928-34,** Cambridge, 1972।

৪। Gail Minault, **The Khilafat Movement Religious Symbolism and Political Mobilisation in India** (Oxford, 1971)।

একক ৪ ❑ কংগ্রেস ও ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণি

গঠন ঃ

৪.১ ভূমিকা

৪.২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কৃষক

৪.৩ কংগ্রেস ও শ্রমিক

৪.৪ দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিপ্-বী জাতীয়তাবাদ ভারতের ভিতরে ও বাইরে

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ ভূমিকা

ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির যে উদ্ভব শু(হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) নানাবিধ কারণে তার বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়। মহাযুদ্ধের শেষে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী তুলনামূলকভাবে একটি শক্তি(শালী শ্রেণি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ১৯৪৪ সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্প সংস্থায় ৬২ শতাংশ এবং (ুদ্রশিল্পের ৯৫ শতাংশ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে চলে গিয়েছিল। চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, পাট, বাগিচা, খনির মত শিল্প যেখানে গোড়ায় বিদেশি মূলধন প্রবল ছিল, সেগুলিরও ভারতীয়করণ ঘটতে থাকে।

এই অবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—এই তিনের মধ্যে একটা বহুমাত্রিক সম্পর্ক দেখা দেয়। বিপানচন্দ্র ও আদিত্য মুখার্জীর মত ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, স্বল্পমেয়াদী নানা স্বার্থের তাগিদে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলেও, দীর্ঘমেয়াদী প্র্ে তাদের পরস্পর বিরোধিতা চাপা ছিল না। অন্যদিকে বাসুদেব চ্যাটার্জী, এ.ডি.ডি. গর্ডন, ক্লড মার্কোভিটস, দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠী প্রভৃতি মনে করেন যে, পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলি নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টি নিয়েছিল। সাধারণভাবে তারা ঔপনিবেশিক সরকারের সাথে সহযোগিতা করব, কিন্তু নিজেদের স্বার্থে যখন আঘাত লাগত তখনই বিরোধিতার নীতি নিত। একেই অধ্যাপক রজত রায় 'একই সঙ্গে সহযোগিতা ও বিরোধিতার নীতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে ভারতে পুঁজিপতি বণিককুল কোনো একমাত্রিক শ্রেণী ছিল না। বৃহৎ, মাঝারি ও (ুদ্র শ্রেণীর স্বার্থ এক ছিল না এবং তার সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিল অঞ্চলগত বৈষম্য।

৪.১.২

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেখা যায় যে মাড়োয়ারী ও গুজরাটি বণিকরা সরকারের নতুন আয়কর ও মুদ্রা (currency) নীতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তাছাড়া, তাঁদের জৈন ও বৈষ(ব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে গান্ধী দর্শনের মিল ছিল। কাজেই গান্ধীর প্রতি তাঁরা খুব সহজেই একাত্মবোধ করেছিলেন। জি. ডি. বিড়লা ও যমুনালাল বাজাজের মত শিল্পপতিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীতে পরিণত হন। কিন্তু পার্শি ও অন্যান্য বড়ো শিল্পপতিরা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতি ততটা সম্পৃক্ত(বোধ গোড়ার দিকে করেন নি। সরকারও তাদের সমর্থন আদায়ে উৎসাহী ছিল।

মন্টফোর্ড সংস্কার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় ভারতীয় বণিকদের বিশেষ প্রতিনিধি রাখার কথা বলে। ১৯১৯ সালের ফিসকাল অটোনমি কনভেনশন এবং ১৯২২ সালের পরে সংর(ণমূলক ট্যারিকের কথা বিবেচনার প্রস্তাবে এঁদের মোটামুটি সন্তুষ্ট করেছিল। রাওলাট সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ও তিলক স্বরাজ তহবিলে মুক্ত(হস্তে অর্থদান করেছেন সাধারণ বণিকেরা। কিন্তু পু(ষোত্তম ঠাকুরদাস ও টাটার মত বোম্বাইয়ের বৃহৎ শিল্পপতিরা অসহযোগ আন্দোলনে নিস্পৃহ ছিল। অবশ্য ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিককূল নির্বিশেষে এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে একমাত্র গান্ধীই পারবেন ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে পুঁজিবাদ বিরোধী চরমপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হওয়ার থেকে।

৪.১.৩

কিন্তু ১৯২২ সালের পর নানা কারণে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিশ্রেণির সব গোষ্ঠীই জাতীয়তাবাদের প(সামিল হয়। যুদ্ধকালীন চাঙ্গা অর্থনীতির (boom) অবসান ঘটে ১৯২১-২২ সালে এবং এরপর যে মন্দা (slump) শু(হয় তা বিশের দশক বরাবর অব্যাহত থাকে। অবিক্রীত অবস্থার বহু দ্রব্যসামগ্রী পড়ে থাকে এবং শ্রম ব্যয়ও বাড়তে থাকে। বোম্বাই সুতাকল মালিকদের সমস্যা আরো বেশি ছিল দুটি কারণে ঃ সূতার (yarn) জন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমদানি-নির্ভর ছিলেন(দ্বিতীয়ত, এই সময় থেকে সস্তার জাপানী সূতীবস্ত্র বাজার ছেয়ে ফেলে, যার সঙ্গে পাল্লা দেবার (মতা ভারতীয় সূতাকলদের ছিল না। ফলে, সূতাকলগুলির শেয়ারের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। মিল মালিকেরা সূতাবস্ত্রের উপর ৩.৫ শতাংশ শুল্ক অবলুপ্তির দাবি জানায় এবং আইনসভার ভেতরে স্বরাজ্য দল এই দাবি সমর্থন করে। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে এই দাবি মেনে নেওয়া হয় কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটে নি। ১৯২৬ সালে এগারোটি মিল বন্ধ হয় ও ১৩ শতাংশ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। ১৯২৭ সালে ইন্ডিয়ান ট্যারিক বোর্ডের সংখ্যাধিক্য সদস্য সূতা ছাড়া সমস্ত বস্ত্রশিল্পের আমদানি শুল্ক পনেরো শতাংশ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ল্যাংকাশয়ার বস্ত্র মালিকদের চাপে সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ পুঁজিপতিদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। ১৯২১ সালে ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি একত্রে এ্যসোচেম (বা এসাসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স) গঠন করে। ১৯২৭ সালে এর বিকল্প হিসাবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা গঠন করেন কিকি (বা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এণ্ড ইন্ড্রাস্ট্রিস)। ১৯২৯ সালে বি(ব্যাপী মহামন্দার প্রভাব ভারতের উপরও আসতে শু(করে। মার্চ, ১৯৩০ সালে সূতাবস্ত্র সংর(ণ আইন অনুযায়ী আমদানি শুল্ক ১১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়, কিন্তু ব্রিটেন থেকে আগত সূতীবস্ত্রের ((ত্রে তা প্রযোজ্য হবে না বলে বলা হয়। এতে জাতীয় শিল্পপতিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়(বিড়লা ও ঠাকুরদাস আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

৪.১.৪

সরকারি মুদ্রা নীতি (Currency Policy) নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। টাকার সঙ্গে পাউন্ড, শিলিং-এর বিনিময় হার উঁচু করে বাঁধা ছিল। ফলে লাভের দিক থেকে ব্রিটিশ রপ্তানিকারীদের সুবিধা হয়েছিল আর মার খেয়েছিল ভারতীয় আমদানিকারীরা। এই মুদ্রা নীতি বিতর্ক পুঁজিপতিদেরও কংগ্রেসকে এক মঞ্চে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। বণিকগোষ্ঠীগুলি মূলত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও 'প্রেশার গ্রুপ' রাজনীতিতে নির্ভরশীল ছিল। যেহেতু স্বরাজ্য দল আইনসভার ভেতর থেকে কাজ করত, ব্যবসায়ীদের এদের সঙ্গে থাকতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু

১৯৩০-এর দশকের গোড়া থেকে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন আবার গণআন্দোলনের পথ ধরল তখনই ব্যবসায়ীদের সামনে সিদ্ধান্তের সংকট দেখা দিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে মহামন্দার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল যে কিছু প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও তারা আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মার্কোভিটস অবশ্য মনে করেন যে, বণিকগোষ্ঠীর প(যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণই কঠিন ছিল কেননা নানান ধরনের জটিলতা ও বিপরীতমুখী টানের দ্বারা তারা জর্জরিত ছিল।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের ঘোষণা (ডিসেম্বর, ১৯২৯) পুঁজিপতিদের কাছে অতিরিত্ত(র‍্যাডিকাল মনে হয়। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক সরকারের ঋণ অস্বীকারের কথা বোম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেটে বিরূপ প্রতিত্রি(য়া সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে কমিউনিস্ট অগ্রগতির ভয়ে এবং ১৯২৮-২৯ সাল থেকে বিভিন্ন শিল্প(ত্রে একটানা শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট চলতে থাকায়, শিল্পপতিরা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেন। কম্যুনিস্ট বিস্তারে আতঙ্কিত হয়ে দোরাবজী টাটা ইঙ্গ-ইউরোপীয়ান মালিকদের যুত্ত(সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। বিড়লা ও ঠাকুরদাসের বাধায় শেষপর্যন্ত এই চেষ্টা পরিত্যত্ত(হয় এবং জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পুঁজিপতিদের বিচ্ছেদের আশঙ্কা দূর হয়। যদিও ইতিমধ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সরকার বামপন্থীদের বি(দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। তাহলেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা বি(্বাস করতেন যে, বামপন্থী বাড়াবাড়ির বি(দ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই বড়ো ভরসা।

কংগ্রেসের কাছেও পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক গু(ত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শু(করার আগে গান্ধী বড়লাটের কাছে যে এগারো দফা দাবি পেশ করেন তার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি দাবি ছিল ভারতীয় পুঁজিপতিদের রূপী-স্টার্লিং বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণ(বস্ত্রশিল্পের সংর(ণ(এবং উপকূলবর্তী জাহাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে অর্পণ। কিন্তু বাস্তব(ত্রে যখন আন্দোলন শু(হল তখন পুঁজিপতিদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলির মতই দোলাচলতা ল(্য করা যায়। বণিক ও দোকানদাররা আন্দোলনে সত্রি(য় সমর্থন জানায় চাঁদা দিয়ে ও বয়কট আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিয়ে। 'ফিকি' আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলনের নীতি সমর্থন ও পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করলেও, শিল্পপতিরা অন্দোলনে প্রকৃত সাহায্য কমই দিয়েছিল। আন্দোলন চলার ফলে শুধু বিদেশি নয়, স্বদেশি কাপড়ের মিলগুলিও (তিগ্রস্ত হতে থাকে কেননা মিলের কাপড়ের বিকল্প হিসাবে খাদিকে জনপ্রিয় করাই কংগ্রেসের ল(্য ছিল। কংগ্রেস ও দেশিয় মিল মালিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শেষে গান্ধী কতকগুলি শর্তের ভিত্তিতে স্বদেশি 'মিলগুলিকে' বয়কটের ডাক থেকে মুত্তি(দেন। মাত্র আটটি ছাড়া বাকী মিলগুলি প্রকাশ্যত শর্ত মেনে নেয়, যদিও অনেক (ত্রে তারা সেগুলি বাস্তবায়িত করেনি। কিন্তু আন্দোলন যতই দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে তাদের (য়(তি ততই বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় গণআন্দোলনের ব্যাপকতা ভবিষ্যতের গণবিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। গান্ধী বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুত্তি(বদ্ধ হয়ে যখন আন্দোলন স্থগিত রাখেন, তাঁর পেছনে যে বহুতর কারণ কাজ করেছিল, তার মধ্যে বাণিজ্যিক লবীর চাপ ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে বিড়লা ও ঠাকুরদাসের নেতৃত্বাধীন ফিকি প্রতিনিধিদল অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়েই গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের দাবি সমর্থন করে। কিন্তু গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয় পর্বে যখন আইন অমান্য শু(হয়, তখন তাকে সমর্থন দিতে পুঁজিপতিরা আরো অনিচ্ছুক ছিল। জাতীয়তাবাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্র্নে তারা আরো বহুধাবিভত্ত(হয়ে পড়ে। ১৯৩২ সালে অটোয়ায় অনুষ্ঠিত ইম্পিরীয়াল ইকনমিক কনফারেন্সে ইংল্যান্ড ও তার ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হলেও, ভারতীয় শিল্পপতিদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল না। ভারতীয় পুঁজিপতিদের একাংশ এই সময় থেকে ব্রিটিশ পুঁজির

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু খুব সহজেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি খুব সহজে হস্তান্তর করবে না এবং সরকারি নীতি পরিবর্তনের মতো (মতা তখনও ভারতীয় পুঁজিপতিরা অর্জন করেনি।

৪.১.৫

১৯৩৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ভারতীয় পুঁজিপতিমাত্রই খুশী হয়েছিলেন। তবে এই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব, জওহরলাল নেহে(ও সুভাচন্দ্র বসুর মত জনপ্রিয় র‍্যাডিকাল নেতাদের আবির্ভাব পুঁজিপতিদের চিন্তিত করে তোলে। আদিত্য মুখার্জী দেখিয়েছেন যে, তা সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উপর নির্ভর না করে বল্লভভাই-রাজাগোপালাচারী-রাজেন্দ্র প্রসাদের মত কংগ্রেসের দ(িণপন্থী অংশের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে এবং স্বয়ং গান্ধীজীকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে। কংগ্রেসের দ(িণপন্থী অংশও পুঁজিপতিদের সাহায্য লাভে আগ্রহী ছিল। সর্বোপরি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ১১টির মধ্যে ৮টি প্রদেশে গরিষ্ঠতা লাভের সুবাদে মন্ত্রীসভা গঠনের মত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের আরো কাছে টেনে আনে। তবে কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে পুঁজিপতিদের একটা বড়ো ভূমিকা থাকলেও, তাদের সাফল্যের পেছনে গণ সমর্থনের জোয়ার ছিল। ১৯৩৭—এর কংগ্রেসকে কখনোই পুঁজিপতিদের দল বলা যায় না।

কংগ্রেস প্রদেশে (মতায় আসার ফলে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়েরই প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়। মাদ্রাজ, ইউ. পি. ও বোম্বাইতে প্রভুত শ্রমিক বি(োভ দেখা দেয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রমিক কল্যাণে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। পুঁজিপতিশ্রেণী তেমন কোন সুবিধা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এতে কিছুটা বিচলিত বোধ করে এবং পুঁজিপতিশ্রেণীকে আ(স্ত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কুখ্যাত বোম্বে ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট (নভেম্বর, ১৯৩৮) যার মালিকঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট ছিল। অন্যান্য কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে এই মেডল অনুসৃত হয়।

৪.১.৬

এরপর থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও কংগ্রেসের সম্পর্ক কৌশলগত হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ পুঁজিপতিই জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল না, কিন্তু তারা সাংবিধানিক রাজনীতির প(পাতী ছিল এবং গণঅভ্যুত্থানকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। ভারত ছাড় আন্দোলন শু(হবার মাত্র চারদিন আগে ঠাকুরদাস, জে. আর. ডি. টাটা ও বিড়লার মত নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শিল্পপতি ভাইসরয়কে লেখেন যে যুদ্ধের মধ্যেই ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়াই একমাত্র সমাধান। আন্দোলন শু(হলে দেখা যায় যে বোম্বাই, আমেদাবাদ, জামশেদপুর ও দেশের অন্যত্র কেবলমাত্র দেশীয় মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং ও সূতাকলেই শ্রমিক ধর্মঘট সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক সমালোচকের মত বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় শ্রমিক ধর্মঘটগুলি মালিক পরিচালিত লক আউট ছাড়া কিছু ছিল না।

৪.১.৭

বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর আবার (মতা হস্তান্তরের জন্য সাংবিধানিক আলাপ-আলোচনা শু(হয় এবং কংগ্রেসী নেতৃত্ব আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসে। পুঁজিপতি সম্প্রদায় এতে আরো নিশ্চিন্ত বোধ করে।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কংগ্রেসের (মতায় আসা প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি কংগ্রেস আঁতাতের রূপরেখা গড়ে ওঠে যা ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ১৯৩৮ সালেই সুভাষ বসুর কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়, তাতে ঠাকুর দাস ও অম্বালাল সরাভাইয়ের মত বিশিষ্ট শিল্পপতিরা সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ সালে সুবিখ্যাত ''বোম্বাই প-্যান'' প্রণয়ন করে শিল্পপতিরা স্বাধীনতা উত্তরকালের পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেন।

৪.১.৮ উপসংহার

সামগ্রিকভাবে ভারতের পুঁজিপতি সম্প্রদায় ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল, অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ''Strategic, issue-based and even pragmatic'' মূলতঃ নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে তাঁরা এই সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও সত্যি যে তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ও দেশদ্রোহী ছিলেন না। পুঁজিপতি ও জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক ছিল তাই অতি জটিল, সতত পরিবর্তনশীল ও বহুমুখীন এক সম্পর্ক।

৪.২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কৃষক

৪.২.১ ভূমিকা

গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষককে কেন্দ্র করেই যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রের ও সামন্ততন্ত্রের বি(দ্ধে অত্যাচারিত কৃষকের প্রতিবাদের ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম দু'দশক তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল নরমপন্থী ইংরাজী শি(িত নাগরিক মানুষদের দ্বারা। কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদাসীন ও অস্বচ্ছ। পরবর্তীকালের চরমপন্থীরাও কৃষকদের সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টা করেননি।

ভারতীয় রাজনীতি(ে ত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে কংগ্রেস যখন প্রথম প্রকৃত গণসংগঠনের রূপ নিল তখন থেকেই জাতীয় আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কের স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন দেখা দিল। বস্তুতঃপ(ে ভারতে ফিরে সত্রি(য় রাজনীতিতে পুরোপুরি যোগ দেবার আগে বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের ও গুজরাটের খেদায় কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দিয়েই গান্ধী সর্বপ্রথম আন্দোলনের আঙিনায় আসেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় কৃষকের কোনো ঐক্যবদ্ধ সত্তা ছিল না— জোতদার, বড়ো, মাঝারি ও ছোটো কৃষক, ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর সমস্তকেই সাধারণভাবে কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত(বলে গণ্য হত। কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনের সম্পর্ক বিচার করার সময় কৃষকশ্রেণীর এই আভ্যন্তরীণ বিভাজনের কথা মনে রাখতে হবে।

৪.২.২

গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাতে গ্রামাঞ্চলের সর্বশ্রেণীর কৃষকও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই প্রথম জাতীয় রাজনীতির মূল আঙিনায় ভারতীয় কৃষকের আত্মপ্রকাশ। করবন্ধের

জন্য কংগ্রেসের আহ্বান বঞ্চিত কৃষকদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলী ও ফৈজাবাদ জেলায় কৃষকরা বাড়তি সেস দিতে অস্বীকার করে। এর ফলে শুধু বিদেশী সরকার নয়, জমিদারদের সঙ্গে রায়তদের মুখোমুখি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় কৃষকরা ইউনিয়ন বোর্ডের কর দিতে অস্বীকার করে এবং এই সূত্রে বাংলাদেশে প্রথম কৃষক ইউনিয়ন গঠিত হয়। বিহারের ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা টানা ভগৎ আন্দোলন শু(করে চৌকিদারী কর ও খাজনা বন্ধ করে। ওড়িষ্যার কণিকা রাজের প্রজারা আবওয়ার দিতে অস্বীকার করে। মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলে গুন্টুর, কৃষ(া ও গোদাবরী জেলায় কর বন্ধ আন্দোলন শু(হলে স্থানীয় অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই দাবি সমর্থন করে। মালাবারের মুসলিম কৃষক ''মোপিলা''-রা স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বি(দ্ধে আন্দোলন শু(করে, অল্পদিনের মধ্যেই এটি সাম্প্রদায়িকতার রঙ পায়।

৪.২.৩

এককথায় অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের প্রথম মেলবন্ধনের চেষ্টা করে যদিও এই সম্পর্কের মধ্যে অনেক রকম টানাপোড়েন ছিল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর (১৯২২) দুটি ধারার মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। ভারতবর্ষে বিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে বামপন্থী চিন্তা ও সংগঠনের পত্তন শু(হলে স্বভাবতঃই বামপন্থীরা কৃষক আন্দোলনের শূন্যতা পূরণের জন্য উদ্যোগী হন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পেজেন্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হয়। এঁরা সামন্ততন্ত্র বিরোধী অত্যন্ত র‍্যাডিকাল কথাবার্তা বললেও হাতে গোনা মাত্র কিছুসংখ্যক কর্মীবাহিনী নিয়ে কৃষকদের মধ্যে প্রথমেই বড়ো আকারে কোনো কাজ করতে পারেন নি।

এদিকে কৃষকদের দাবির প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীও নানান বিষয়ের উপর নির্ভর করে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে বদলাতে থাকে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রধান দুটি গোষ্ঠী (যথাত্র(মে সুভাষ বসু ও জে. এম. সেনগুপ্ত গোষ্ঠী বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন) বাংলা প্রজাসত্ব সংশোধনী বিল আলোচনাকালে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) কৃষক ও ভাগচাষী বিরোধী ও জমিদার ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গী অতি নগ্নভাবে প্রকাশ করেন। জে. এল. ব্যানার্জীর মত মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী আইনসভায় সংশোধনী বিল সমর্থন করেন। হিন্দু ''জমিদার'' বনাম মুসলিম ''বর্গাদার'' ছবি ফুটে ওঠে যদিও মুসলমানদের মধ্যেও অনেক জমিদার ছিলেন এবং বর্গাদার বিরোধিতায় তাঁরা হিন্দুদের চেয়ে কম যেতেন না। এই অবস্থায় ১৯২৯ সালে কৃষক প্রজা পার্টি বাংলাদেশে জন্মলাভ করে। জে. এল. ব্যানার্জী, নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্তের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী হিন্দু গোড়ার দিকে এর সঙ্গে যুক্ত(থাকলেও এটি ছিল মূলতঃ মুসলিম ধনী কৃষকের দল।

অনুরূপভাবে পাঞ্জাবে ফজল-ই-হুসেনের নেতৃত্বে কৃষকের স্বার্থ র(া ও কংগ্রেস-হিন্দুসভা সমর্থক জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরোধিতা করার জন্য ইউনিয়ানিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মুসলিম অধ্যুষিত হলেও জাঠ হিন্দুদের একটি বড়ো অংশ ইউনিয়ানিস্ট পার্টিতে যুক্ত(ছিল। প্রজা পার্টি ও ইউনিয়ানিস্ট পার্টি উভয়েরই কৃষক ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বড়ো দুর্বলতা ছিল যে, তা মূলতঃ ধনী ও বড়ো কৃষকদেরই স্বার্থর(া করত। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস কৃষকদের এইরকম মডারেট ধরনের দাবি-দাওয়ার প(ও দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিল না।

বাংলা ও পাঞ্জাবের মত বিহারেও কংগ্রেস জমিদার ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেছিল।

জমিদারী ব্যবস্থার তুলনায় রায়তওয়ারী অঞ্চলে কংগ্রেসের প(কৃষকদের দাবির স্বপ(আসা সহজ ছিল।

যেমন, অন্ধ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ সরকার ১৮$\frac{৩}{৪}$% রাজস্ব বৃদ্ধি চেষ্টা করলে তার বি(দ্ধে কৃষক আন্দোলন সংগঠনে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা যোগ দেন।

কৃষক আন্দোলনে কংগ্রেস একমাত্র সাফল্য দেখায় গুজরাটের বরদৌলী তালুকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে এখানে গান্ধীজীর একটি কেন্দ্র সত্রি(য় ছিল। স্থানীয় সংগঠকদের আহ্বানে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পাতিদের কৃষকদের সরকারের কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হন। বরদৌলী এক জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয় ও শেষপর্যন্ত সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করে।

৪.২.৪

এরপর ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রে ভারতীয় রাজনীতিতে গণআন্দোলনের জোয়ার আসে। বহু জায়গায় কৃষকরা কর বন্ধ আন্দোলন শু(করেন। কিন্তু তাদের অভাব অভিযোগের অনেক গভীর ভিত্তি ছিল। বি(ব্যাপী মহামন্দার পরিপ্রে(তে (১৯২৯) আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্যের বাজারে দাম কমতে থাকে। যেহেতু কৃষকদের লভ্যাংশ কমতে থাকে, তাদের জমিদারকে দেয় খাজনা এবং সরকারকে দেয় ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর বাকি পড়তে থাকে। কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনে এই সুযোগে কৃষকদের টেনে আনার চেষ্টা করে, কৃষকরাও তাদের সংগ্রামে কংগ্রেসকে কাছে পাবার চেষ্টা করে।

উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে দাবি জানায় যে জাতীয় ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব কমাতে হবে(সমস্ত ঋণ শোধের উপর এবং জমিদারদের প্রজা উচ্ছেদের উপর স্থগিতাদেশ (meratorium) জারি করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেবলমাত্র প্রথম দাবিটি সমর্থন করে। যা কৃষক ও জমিদার উভয় প(কেই সন্তুষ্ট করত কিন্তু অন্য দু'টি দাবি গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। উত্তরপ্রদেশেই বামপন্থী কৃষক আন্দোলন সবচেয়ে জোরদার হয়। বিশেষ করে এম. এন. রায় ও তাঁর সহযোগীদের প্রভাবে এলাহাবাদ ও অযোধ্যার গ্রামাঞ্চলে কর বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়।

পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে, যেখানে প্রধান শস্য ছিল পাট, বি(ব্যাপী মহামন্দার ফলে বি(ের বাজারে চটের দাম কমে যাওয়ায় উৎপাদনকারী কৃষকরা বিপন্ন হয়। তারা কর দেওয়া বন্ধ করে। হাজার নির্যাতন ও পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও তারা নতমস্তক হয়নি। শেষপর্যন্ত সরকার সৈন্য নামাতে বাধ্য হয়।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে বেরারের বুলদানা জেলায় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা তুলা চাষীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকলে, চাষীরা কৃষক ইউনিয়ন তৈরি করে কর দেওয়া বন্ধ করে ও খাজনা দেওয়াও বন্ধ করে। কৃষক স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারে বেরোয়(জমিদার ও মহাজনদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ও তাদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক সম্প্রদায় এই স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণে অংশ নেয়।

বিহারে কিষাণ সভা গড়ে ওঠে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে। বিহারের পশ্চাদ্‌পদ জেলাগুলিতে কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন কার্যানন্দ শর্মা। পরবর্তীকালে তিনি কম্যুনিস্ট দলে যোগদান করেন। সহজানন্দ কিন্তু বামপন্থী সদস্য হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যেই থেকে যান।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্তগান্ধী গফ্‌ফর ফানের অনুগামী খুদা-ই-খিদ্মাৎগার ও দ(িণ মহারাষ্ট্রে রায়বাদীরা কৃষকদের দাবি দাওয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

দ(িণ মহারাষ্ট্রের পার্(্ববর্তী হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্যে গান্ধীবাদী স্বামী রামানন্দ তীর্থ এক শক্তি(শালী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন।

আসামের শ্রীহট্ট জেলায় মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভামানীর নেতৃত্বে এক শক্তি(শালী কৃষক আন্দেলন গড়ে ওঠে যা পরবর্তীকালে পার্(্ববর্তী পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

ল(্য করার বিষয় হল যে অসহযোগ আন্দোলনের সমসাময়িককালে এই সমস্ত কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠলেও, এইসব আন্দোলনগুলিই ছিল বিচ্ছিন্ন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের দ্বারা আদৌ নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কিষাণ সভার স্থানীয় শাখা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় কম্যুনিস্ট বা কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের নেতৃত্বে। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে এই কৃষক আন্দোলনগুলি সহায়ক হয়েছিল। জঙ্গী কৃষক লড়াই করেছেন নিঃসন্দেহে নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য, কিন্তু সেই লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন ও বুঝতে পারেন যে সাম্রাজ্যবাদই সকল দুর্গতির মূল।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে রাজনৈতিক জীবনে আবার শূন্যতা নেমে আসে। এই সময় শ্রমিক ও কৃষককে সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসেন গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা। গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মীরা বিভিন্ন 'আশ্রম' গড়ে তুলে কৃষকদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন এবং সেইসব জায়গায় কৃষকদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল আঙিনায় নিয়ে আসতে স(ম হবেন। ভারতের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বাংলাদেশে আরামবাগ, কুমিল্লা, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে এইরকম গ্রামীণ অশ্রম গড়ে উঠেছিল। আবার অনেক পশ্চাদ্পদ অঞ্চলে স্থানীয় ধর্মপ্রচারক বা ধর্মগু(রো কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ধর্মীয় আবেগ ও বি(্বাসকে কাজে লাগান। অন্যত্র সাধারণভাবে স্থানীয় ও শ্রেণীগত সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বামপন্থীরা কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এইসব প্রচেষ্টাই চরম পরিণতি লাভ করে সারা ভারত কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

৪.২.৫

অন্ধ্রে এন. জি. রঙ্গ ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রাদেশিক রায়ত এসোসিয়েশন এবং জমিদারী প্রজাদের জন্য জমিন রায়তম এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। রঙ্গ ১৯৩৫ সাল থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত করার ও খেতমজুরদেরও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত(করার চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে রঙ্গকে সাধারণ সম্পাদক ও ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদকে যুগ্ম সম্পাদক করে South Indian Federation of Peasants and Agricultural Labour গঠিত হয়। এঁদের মধ্যে সম্মেলনে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। সমাজতন্ত্রীরা ১৯৩৬ সালে মীরাট সম্মেলনে এই দাবি সমর্থন করেন। সারা ভারত কিষাণ সভার প্রথম সম্মেলন হয় ল(্নৌতে (১৯৩৬)। গুজরাটের বি(্দ্ধ গান্ধীবাদী নেতা ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সম্পাদনায় কিষাণ সভার মুখপাত্র হিসাবে কিষাণ বুলেটিন প্রকাশিত হয়। কিষাণ সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী।

কিষাণ সভার দাবি সনদ ল(্য করলে দেখা যায় যে এতে ভূমিহীন কৃষক বা খেতমজুরের তুলনায় জোতমালিক কৃষকদের দাবি দাওয়ার উপর বেশি জোর পড়ে। কৃষক সমাজের মধ্যেকার বিভাজন এবং তদ্জনিত সমস্যাগুলিকে এঁরা কিছুটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিষাণ সভার মূল দাবিগুলির মধ্যে ছিল ঃ কর ও খাজনা ৫০ শতাংশ হ্রাস, সব প্রজাকে চাষের সত্ব অধিকার দেওয়া, বেগার প্রথার অবলুপ্তি(ঋণ ও সুদ মকুব, বন্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। সারা ভারতে কিষাণ সভার প্রাদেশিক শাখা বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর নীচে ছিল জেলা

ও অঞ্চল শাখাগুলি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণসভার প্রথম সম্মেলন বসে বাঁকুড়ার ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে। কৃষক আন্দোলন এই সময় দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সম্প্রসারিত হয়। এইসব জায়গায় কৃষক নির্যাতন ছিল আরো বেশী।

৪.২.৬

নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি তে কংগ্রেস (মতাসীন হলে স্বভাবতঃই কৃষকদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কংগ্রেস সরকারগুলি কৃষক স্বার্থে কিছু সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নেন যেমন সুদের হার নির্দিষ্টকরণ, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে বৈধ কৃষকদের উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে গোচারণ কর তুলে নেওয়া। কিন্তু জমিদারী প্রথা অবসানের মত মৌলিক দাবির বিষয়ে তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন। কোন প্রদেশেই কংগ্রেস বা অ-কংগ্রেসী সরকারের কেউই শক্তি(শালী ভূস্বামী শ্রেণীর সমর্থন খোয়ানোর ভয়ে জমিদারী উচ্ছেদের বিষয়ে আদৌ অগ্রসর হতে পারেন নি।

এই অবস্থায় ১৯৩৭-৩৯ সালের মধ্যে কিষাণ সভার সমর্থক সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তারা ত্র(মশঃই জঙ্গী হয়ে ওঠে, বিশেষতঃ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের প্রভাব কৃষক সংগঠনের উপর দ্রুত বাড়তে থাকে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা, পুলিশ ও জমিদারদের অত্যাচার কিছুই কৃষকদের আন্দোলনের গতি (দ্ধ করতে পারেনি।

৪.২.৭

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শু(হবার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করার পর আন্দোলনমুখী রাজনীতিতে কিছুটা ভাটা পড়ে (১৯৩৯)। কিন্তু ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে সারা ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যে অভূতপূর্ব জনজাগরণ সৃষ্টি হয়, কৃষক সমাজ তাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলধারায় কৃষকরা প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও কৃষকের জন্য বিশেষ কোনো কর্মসূচী কংগ্রেস তখনও গ্রহণ করেনি। যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কৃষকদের মধ্যে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে তেভাগা আন্দোলন (অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে এক-তৃতীয়াংশ দাবি) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

৪.২.৮ উপসংহার

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে কৃষককে বাদ দিয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন কখনও গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই কংগ্রেসের আন্দোলনেও ল(ল(কৃষক সামিল হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল বহু-শ্রেণিক (multi-class) আন্দোলন(কাজেই কংগ্রেস অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে কৃষকদের এমন কোনো দাবি-দাওয়াকে সমর্থন করতে পারেনি। এর ফলে, কৃষক আন্দোলন মূলতঃ স্বাভাবিকভাবেই চলে যায় বামপন্থীদের হাতে। আবার যেহেতু ভারতের কৃষক সমাজ বহুধা ধারায় বিভক্ত(ছিল, তাই কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি(শালী কৃষক আন্দোলনও গড়ে তোলা সহজ ছিল না।

৪.৩ কংগ্রেস ও শ্রমিক

৪.৩.১ ভূমিকা

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় পুঁজির বিনিয়োগের ফলে ভারতে বাগিচাশিল্প, খনি, পাট ও বস্ত্রশিল্প,

লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা এবং রেলওয়ের মত নতুন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে ভারতের সমাজজীবনে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে— তাহল শিল্প শ্রমিকশ্রেণী। যদিও প্রচলিত মার্কসীয় অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী হিসাবে ভারতে আদৌ উদ্ভব ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর মগ্নচৈতন্য তার কৃষকসভা দীর্ঘদিন পর্যন্ত লুকিয়ে ছিল। স্বভাবতঃই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের সময় শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক নানা ধরনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছিল।

৪.৩.২

প্রথম পর্বে অর্থাৎ প্রাক্ ১৯০০ যুগে শ্রমিক আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন ও পূর্বপরিকল্পনাহীন। তাৎ(ণিক (োভে শ্রমিকরা ফেটে পড়ত, বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। মডারেট পরিচালিত কংগ্রেস নেতৃত্বেরও শ্রমিকদের বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। বাংলা শশীনন্দ ব্যানার্জী ও বোম্বাই-এর এন. এম. লোখাণ্ডের মত মানবতাবাদীরা শ্রমিকদের হিতসাধনের চেষ্টা করলেও তাঁদের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ ছিল না।

দ্বিতীয় পর্ব ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ (১৯০৩-০৮) চরমপন্থী রাজনীতিকরা সর্বপ্রথম শ্রমিক সাধারণের বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাঁদের উৎসাহ ছিল (ণস্থায়ী এবং আংশিক। ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আন্দোলনে তারা যত উৎসাহী ছিলেন, স্বদেশি শিল্পের ব্যাপারে ঠিক ততটাই ছিলেন উদাসীন। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক ছিল হাতিয়ার, কিন্তু শ্রমিকের নিজস্ব অভাব অভিযোগ নিয়ে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

৪.৩.৩

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিকদের উপর আঘাত আসে। সমস্যা তীব্রতর হয় যুদ্ধ শেষে ব্যাপক ছাঁটাই ও বেতন হ্রাসের ফলে। ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এক নতুন যুগের সূচনা করে। কংগ্রেস সংস্কারবাদী সাংবিধানিক চরিত্র কাটিয়ে উঠে গণমুখী ও আন্দোলনবাদী চরিত্র অর্জন করে। গান্ধীর মধ্যে সেই নেতৃত্বগুণ ছিল যা সব প্রদেশের সব শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করতে পারত। কাজেই এই সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত(হবার সুযোগ পেল। যদিও এই সময় যে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট ঘটেছিল, তার প্রায় সবগুলিই ছিল অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন যে সাধারণ রাজনৈতিক প্রে(াপট রচনা করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি প্র(ে দেখা দেয়। প্রথমত, পূর্ববর্তী অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এই পর্বের শ্রমিক আন্দোলনের পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু তখনও শ্রমিক আন্দোলন শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক গণআন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্ক স্পষ্ট তখনও হয়নি। চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে একাংশ চেয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে যদিও দাস মার্কসবাদী ছিলেন না, ছিলেন র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী। কিন্তু স্বয়ং গান্ধী মনে করতেন যে, এই প্রস্তাব অবাস্তব ও নিষ্ফল। দাসের প্রস্তাব গ্রহণ করলে জাতীয় আন্দোলন নিঃসন্দেহে শক্তি(শালী হবে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দাবি সমর্থন করতে গেলে দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সমর্থন হারাতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প(সেটা সম্ভব ছিল না।

৪.৩.৪

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা ও শ্রমিক আন্দোলনের ধারা আবার দুটি খাতে বইতে শু(করে। অধিকাংশ কংগ্রেসী শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ হারায় এবং সংসদীয় রাজনীতিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনে যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে বামপন্থীরা। সাম্যবাদের ধারণা কুড়ির দশকের মধ্যভাগে ভারতে বিস্তৃত হতে থাকে। শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা বামপন্থীদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য হত।

৪.৩.৫

গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ঠিক এক দশক বাদে আবার শু(হল দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন। ইতিমধ্যে বি(েব্যাপী মহামন্দার (১৯২৮-৩৪) প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতির উপর পড়তে শু(করেছিল। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর বি(ে হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সামান্য কিছু ব্যতিত্র(ম বাদ দিলে ১৯২৭-২৯ সালের তুলনায় বা এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের তুলনাতেও শ্রমিকশ্রেণীর আইন অমান্য আন্দোলনে নি(ি(য়তা ছিল চোখে পড়ার মত। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে পূর্ববর্তী এক দশকে কংগ্রেসের উপর বণিক শিল্পপতিশ্রেণীর প্রভাব যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, শিল্প শ্রমিকদের উৎসাহ সেই হারেই কমতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় কংগ্রেস থেকে যে কতটা সরে গিয়েছিল এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর উপর কম্যুনিস্টদের ত্র(মবর্ধমান প্রাধান্যেরও ইঙ্গিত এর থেকে পাওয়া যায়। ১৯২৮ সালে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে জাতীয় বুর্জোয়া পরিচালিত সংগঠন ও আন্দোলন থেকে বি(ের সর্বত্র কম্যুনিস্টদের সরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হন কম্যুনিস্টরা।

৪.৩.৬

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে শ্রমিক আনোদলনও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্পর্কের (ে ত্রে এক নতুন অধ্যায় শু(হয়। ১৯৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠনের ও আইনসভায় শ্রমিক কেন্দ্র থেকে শ্রমিক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনী রাজনীতির বাধ্যবাধকতা কংগ্রেসকে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার ও ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকৃত হয়। নির্বাচনে ১১টির মধ্যে ৭টি রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়।

স্বভাবতঃই নির্বাচিত সরকারের কাছে শ্রমিক সাধারণের প্রত্যাশা ছিল বিরাট। কিন্তু নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভগ্নাংশই পূরণ করা গিয়েছিল। কাজেই তার ফলে স্বভাবতঃই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে হতাশা ও বি(ো ভ দেখা দেয়। ল(ণীয় বিষয় হল যে, ১৯৩৭-৩৯ সময়সীমার মধ্যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি না ঘটলেও, চারপাশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে শ্রমিকরা তাদের দীর্ঘমেয়াদী দাবি-দাওয়া নিয়ে উত্তাল হয় ওঠে। এই অবস্থায় কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বোঝাপড়ার গু(তর সংকট দেখা দেয়। এই সুযোগে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা শ্রমিক মহলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নেয়।

৪.৩.৭

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শু(হবার পর জাতীয়তাবাদী ও শ্রমিক আন্দোলনে নতুন পর্ব

শু(হয়। যুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব সমাজের সবশ্রেণীর মত শ্রমিকদেরও বিপর্যস্ত করেছিল(মহার্ঘভাতা, রেশনিং ইত্যাদির দ্বারা তার সামান্য সমাধানই ঘটেছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে কংগ্রেস খুব একটা আন্দোলনে উৎসাহী ছিল না, বরঞ্চ কম্যুনিস্টরাই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে উদ্বোধিত করে।

কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী রাশিয়া আত্র(মণ করার পর কম্যুনিস্টদের চোখে যুদ্ধের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী থেকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হলে কম্যুনিস্টরা সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য দেবার নাম সমস্তরকম শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সময় থেকেই কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধিতা তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারত ছাড় আন্দোলন শু(হয়। এই ভারত ছাড় আন্দোলনে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র। আমেদাবাদ এবং জামশেদপুরের মত জায়গা যেখানে মালিকপ(ছিল কংগ্রেস সমর্থক এবং ইউনিয়নগুলি ছিল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত, কেবলমাত্র সেখানেই উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। ভারত ছাড় আন্দোলনের সূত্রে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হওয়ার ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগ কম্যুনিস্টরা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

৪.৩.৮

শ্রমিকশ্রেণীর উপর জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবের গু(ত্ব আবার নতুন করে অনুভূত হয় ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে। ১৯৪৬ সালের আইনসভা নির্বাচনে শ্রমিক আসনের জন্য কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট প্রার্থীরা পরস্পরের মুখোমুখি হন। যুদ্ধ শেষে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল তাতে অধিকাংশ শ্রমিক কেন্দ্রেও কংগ্রেস প্রার্থীরা বিজয়ী হন। এখন কংগ্রেসের সামনে সমস্যা হল ভোট বাক্সের এই সমর্থন সংগঠনে রূপান্তরিত করা। জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীবাদী হিন্দুস্তান মজদুর সেবক সংঘের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন (১৯৪৫), অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে নিজ ছত্রছায়ায় আনার জন্য কংগ্রেসের মরিয়া প্রয়াস (১৯৪৬) এবং তাতে ব্যর্থ হলে, সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭)—এইসব ধাপগুলিই ছিল এই চিন্তার ফসল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্বে (১৯৪৫-৪৭) দেখা যায় শ্রমিকশ্রেণীর উপর নানাভাবে আঘাত আসছে— ছাঁটাই, বেতন হ্রাস, ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করা ইত্যাদির দ্বারা। অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে মার্চ, ১৯৪৬ সময়কালে প্রায় তিনটি শিল্পে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ল(ণীয় যে, অধিকাংশ দাবি-দাওয়া ছিল অর্থনৈতিক এবং দাবি অংশত পূরণের পরেই ধর্মঘটীরা কাজে ফিরে যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে তারা সত্যকারের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। ততদিনে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ (মতা হস্তান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল, কাজেই শ্রমিক অশান্তিকে তারা পরিহার করেই চলতে চেয়েছে।

৪.৩.২ উপসংহার

সব মিলিয়ে দেখলে জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক কখনোই নিবিড় হয়নি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারা থেকে শ্রমিকশ্রেণী সাধারণভাবে দূরেই ছিল। গান্ধী স্বয়ং এই শিল্প সম্পর্কে যে অনবহিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু শ্রমিককে রাজনীতির ত্রীড়নক হিসাবে তিনি দেখতে চাননি। তাঁর কল্পিত মডেল ছিল আহমেদাবাদ সূতাকল শ্রমিকের সংগঠন। তাঁর নিজের হাতে গড়া মজুর মহাজন। অরাজনৈতিক ও কল্যাণকামী

সংস্থা হিসাবে তিনি তা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস গান্ধী প্রস্তাবিত আদর্শ গ্রহণ করতে পারেনি। তার ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেখা গেল বহুধাবিভক্ত(ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠা অজস্র শ্রমিক সংগঠন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন কোনটাই এর ফলে পুষ্টি লাভ করতে পারেনি।

৪.৪ দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিপ্-বী জাতীয়তাবাদ ভারতের ভিতরে ও বাইরে

৪.৪.১ ভূমিকা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্-বী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের সংযোজন করেছিল। এর পটভূমি রচনা করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতীর মত হিন্দু পুন(জ্জীবনবাদীদের শি(া(লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতার মত চরমপন্থীদের লাগাতার প্রচার, আন্তর্জাতিক (ে ত্রে ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে মাৎসিনি ও গ্যারীবল্ডীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, রাশিয়ায় নিহিলিস্টদের আত্র(মণ, রাশিয়ার বি(দ্ধে প্রাচ্যের নবজাগ্রত শক্তি(জাপানের সাফল্য।

ঊনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়াতেই এই বিপ্-বী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি, চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় রাজনৈতিক মতেরই ব্যর্থতা যুবকদের এক বড়ো অংশকে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রথম মহাযুদ্ধ শু(হবার পর (১৯১৪) বিপ্-বী আন্দোলনে এক নবপর্যায় শু(হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যায়। ভারতের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্-ববাদের প্রধান (ে ত্র হয়ে দাঁড়ায় মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব।

৪.৪.২

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্কে (১৮৪৮-৫২) ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জনক বলে পরিচিত। এরপর মহামান্য তিলকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের ফলে সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। যেমন, মিত্রমেলা, অভিনব ভারত সমাজ, আর্য বান্ধব সমাজ প্রভৃতি। চাপেকার ভ্রাতাদের ও বীর সাভারকরের নাম এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু নানা কারণে প্রথম মহাযুদ্ধ শু(হবার আগেই মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত শিখধর্মের গৌরবোজ্জ্বল অতীত, কৃষকদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ আর্যসমাজের প্রভাব এবং লাজপত রায়ের অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। অজিত সিং ও লালা হরদয়ালের দেশত্যাগের ফলে (১৯০৮-১০) প্রথম পর্যায়ের বিপ্-বী আন্দোলনের অবসান ঘটে।

বাংলাদেশে প্রাচীনতম বিপ্-বী সংগঠন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালে। ১৯০৬ সালে বিপ্-বীদের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা যুগান্তর। পরে অনুশীলন সমিতি থেকে একটি গোষ্ঠী বেরিয়ে গিয়ে যুগান্তর সমিতি নামে আর একটি গুপ্ত সমিতি স্তাপন করেন। অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন। কিন্তু (ুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুর বোমার মামলায় ধরা পড়ার সূত্রে এই সমিতির গুপ্ত কাজকর্মের সন্ধান পায় পুলিশ। এর ফলে শু(হয় বিখ্যাত মুরারীপুকুর বোমার মামলা। এই মামলার সূত্রে (১৯০৮-১০) যুগান্তর

দলের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেফতার হন। অরবিন্দ নিজে মুক্তি(পেলেও সক্রি(য় রাজনীতি ত্যাগ করে সাধনার জন্য পণ্ডিচেরী চলে যান।

৪.৪.৩

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শু(হয় প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শু(হবার কাছাকাছি সময় থেকে। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম পর্বের কর্মকাণ্ড মূলত সরকারি আধিকারদের হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্বে বিপ্-বীরা আরো বড়ো আকারে সরকারি শাসনযন্ত্রের উপর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এইজন্য দেশের বিভিন্ন অংশের গুপ্ত সমিতিগুলি একত্র হয়ে এমনকি বিদেশের সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্র আনিয়ে বিপ্-বী কর্মকাণ্ড চালাতে সচেষ্ট হয়েছিল।

বাংলার অনুশীলন সমিতি রাসবিহারী বসুর অসামান্য নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়ে উত্তর ভারতে তার কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করে। ১৯১২ সালে দিল্লীতে ভারতের নতুন রাজধানী স্থাপিত হবার সময়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের দিল্লী প্রবেশ কালে বোমা নি(ে প করে তাঁকে হত্যা করার এক পরিকল্পনা করেন রাসবিহারী। শেষপর্যন্ত অবশ্য বড়লাট প্রাণে বেঁচে যান। এরপর মহাযুদ্ধ শু(হয়ে গেলে রাসবিহারীর পরিকল্পনা ছিল উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবের বিপ্-বী গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে বিভিন্ন সৈন্য ব্যারাকে এক সঙ্গে অভ্যুত্থান ঘটানো। ১৯১৫ সালের একটি বিশেষ দিন স্থরীকৃত হয়। কিন্তু একজন সৈন্যের বি(্বাসঘাতকতায় এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি(গ্রেফতার হয়। পুলিশ তন্ন তন্ন করে রাসবিহারীর সন্ধান করতে থাকে। রাসবিহারী ছদ্মনাম পি. ঠাকুর ধারণ করে জাপানে চলে যান। বাকী জীবন তিনি জাপানেই অতিবাহিত করেন এবং সেখান থেকেই ব্রিটিশের বি(দ্ধে লড়াই জোরদার করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (বা আই. এন. এ.) প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই ঘটেছিল।

দ্বিতীয় পর্বে যুগান্তর গোষ্ঠী পুনর্জীবিত হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানী করে অভ্যুত্থানের এক গোপন পরিকল্পনা তাঁরা প্রস্তুত করেন। কোনোভাবে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে তা ফাঁস হয়ে যায়। ওড়িশ্যার বালে(্বরের সমুদ্রোপকুলের কাছে বুড়ীবালাম নদী তীরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে 'বাঘা যতীন' ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা নিশ্চিত ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। ভারতীয় বিপ্-বী আন্দোলনের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের এইভাবে অবসান ঘটে।

অসামান্য বীরত্ব সত্ত্বেও উপযুক্ত(সাংগঠনিক কাঠামো, জনসমর্থন ও অর্থের অভাব এবং সরকারি গোয়েন্দাবাহিনীর যোগ্যতর পরিকাঠামোর দ(ন সশস্ত্র বিপ্-ববাদের ধারাবাহিক ত্র(মান্বয়িক ব্যর্থতা স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসাবে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্র(্নের উদ্রেক করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনের এক নতুন রাজনীতি শু(হয়। সব কিছু মিলিয়ে উনিশশো বিশের দশকের প্রথম দিকে সশস্ত্র আন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে।

৪.৪.৪

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের কার্যকলাপ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাইরেও তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়েছিল। বহির্বি(্বে বসবাসকারী ভারতীয়, ভারত থেকে নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী ও বিদেশে কর্মরত সৈনিক—সব শ্রেণী থেকেই এই বিপ্-বী দলগুলির কর্মী ও সমর্থকরা এসেছিল। এদের কাজ ছিল প্রধানত—(১) ভারতীয় বিপ্-বীদের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের যোগান দেওয়া। (২) ভারতীয় ছাত্র ও অভিবাসী ভারতীয়দের

মধ্য থেকে নতুন বিপ্-বী সংগ্রহ করা এবং ভারতীয় যুদ্ধ বন্দী ও ভারতীয় ইউনিটের সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শ্যামাজী কৃষ(বর্মার নেতৃত্বে লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে বিদেশে প্রথম সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী ত্রি(য়াকলাপের দিক্চিহ্(বলা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নজরদারী ও ত্র(মাগত বাধাদানের ফলে বিপ্-বীদের মূল কর্মকেন্দ্র লন্ড থেকে প্যারিসে সরে যেতে বাধ্য হয়। বিপ্-বী নেত্রী মাদাম কামা প্যারিস থেকে 'তলোয়ার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শু(করেন। লন্ডন থেকে অধিকাংশ বিপ্-বী কর্মীই প্যারিসে চলে আসেন। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শু(হলে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর দ(ন ফরাসী সরকার ভারতীয় বিপ্-বীদের আর কাজ চালাতে দিতে রাজী ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবশ্য ভারতীয়দের সামনে নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। যুদ্ধে জার্মানী ব্রিটিশ বিরোধী প(ে শীর্ষস্থানে ছিল, তাই ভারতীয় বিপ্-বীদের ব্রিটেনের বি(দ্ধে সাহায্য দিতে সে উৎসাহী ছিল। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি নামে একটি বিপ্-বী গোষ্ঠী জার্মানীতে সত্রি(য় ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শু(হবার পরে বি(্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতীয় বিপ্-বীরা বার্লিনে মিলিত হয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স কমিটি গঠন করেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন দত্ত, চম্পকরমণ পিল্লাই প্রভৃতি বিশিষ্ট বিপ্-বীরা এই কমিটিতে যোগ দেন। এই কমিটি ভারতে বিপ্-বী গোষ্ঠীগুলি এবং জার্মানীর সরকারি অফিসারদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত এবং ভারতে অস্ত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করত। বাঘা যতীন প্রস্তাবিত অভিযানের সঙ্গে এই বার্লিন কমিটির সংযোগ ছিল।

১৯১৫ সালে জার্মানীর সমর্থনে কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ী ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হন বরকতুল্লাহ। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ শু(হবার পর ভারতের প্রসিদ্ধ ঐল্লামিক শি(াকেন্দ্র দেওবন্ধ থেকে বহুসংখ্যক কর্মী গোপনে ভারত ত্যাগ করে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যান। এই মুজাহিরদের নেতা ওবেইদুল্লা সিন্ধি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে অস্থায়ী সরকারে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার মুজাহিরদের বিষয় জানতে পারে ও ভারতে তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেফতার করে ও তাদের বি(দ্ধে রেশমী (মাল মামলা চালু করা হয়।

আমেরিকাতেও ভারতীয় বিপ্-বীদের কর্মকাণ্ড পিছিয়ে ছিল না। ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেখানে মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিপ্-বী ছিল এবং অনেক (ে ত্রেই তারা সং(-ষ্ট সরকারের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমেরিকায় ও কানাডায় সশস্ত্র বিপ্-বী সংগঠনগুলির ব্যাপক গণভিত্তি ছিল ও সাধারণ মানুষের সমর্থনের উপরই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১৩ সালে আমেরিকার 'এ্যস্টোরিয়ায়' গদর পত্রিকা ও তার সাথে যুক্ত(গদর পার্টি নামে এক বিপ্-বী দল স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শুধু আমেরিকা ও কানাডায় নয়, পূর্ব ও দ(িণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেমন চীন, জাপান, মালয় ও সিঙ্গাপুরে গদর পার্টি তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে। কামাগাতামা(জাহাজকে কেন্দ্র করে ভারতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গেও সম্ভবত গদর পার্টির যোগ ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে, মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে আমেরিকায় ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ কড়া হাতে দমন করা হয়। ভারতীয় বিপ্-বীদের বিখ্যাত হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১৮) অভিযুক্ত(করা হয়। এদিকে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি(র বি(দ্ধে জার্মান-ভারতীয় যোগাযোগের সম্ভাবনা নষ্ট হয়। ইতিমধ্যে, বলশেভিক বিপ্-বের ফলে রাশিয়ায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে (১৯১৭) জার্মানী থেকে বিপ্-বীদের একটি গোষ্ঠী রাশিয়ায় চলে যান। এঁদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে প্রবাসী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম গঠিত হয়।

এইভাবে বিদেশে ভারতের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন গোষ্ঠী মধ্যে ঐক্য ও যোগাযোগের অভাব, ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের অপ্রতুলতা, ব্যাপক গণভিত্তি না থাকা প্রভৃতি নানা কারণে এইসব প্রবাসীদের কর্মকাণ্ড সফল হয় নি। কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি তাঁরাই প্রথম সার্থকভাবে জগৎসভায় উত্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাছড়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিদেশে সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে গেলেও তার ধারা যে একেবারে লুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণ আবার পাওয়া যায় দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত আই.এন.এর. (বা ভারতের জাতীয় বাহিনী) ঐতিহাসিক অভিযানের সময়।

৪.৪.৫

দেশের ভিতরে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক প্রত্যাহার (১৯২২) কংগ্রেসের মধ্যে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তন বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক, স্বরাজ্য দলের উত্থান ও ব্যর্থতা, সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ব্রিটিশ নীতির প্রতি জনসাধারণের আস্থাহীনতা সব কিছু মিলিয়ে কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আবার নতুন জোয়ার আসে।

১৯২৪ সালে উত্তর ভারতের বিপ-বীরা মিলিত ভাবে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যরা কাকোরী রেল স্টেশনে এক মেল ট্রেনে অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতিতে লিপ্ত হন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় চারজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর মৃত্যুদণ্ড হয়। (১৯২৫) এরপর সংগঠনের নতুন নাম হয় হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। নেতৃত্বে আসেন ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদ। পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ-বী ভগৎ সিং পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর ভারতে বিপ-বী আন্দোলনে এক নতুন মোড় নিয়ে আসেন। পুলিশের লাঠি চালনায় বরেণ্য দেশনেতা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে দায়ী পুলিশ অফিসার ল্যান্ডার্সকে হত্যা করেন ভগৎ সিং ও বটুকে(্বর দত্ত। (১৯২) পরের বছর কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন ক(ভগৎ সিং ও বটুকে(্বর বোমা নি(প করেন। কেউই পালাবার চেষ্টা করেন নি এবং ঘোষণা করেন যে কাউকে আঘাত করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল সরকারি দমন নীতির বি(দ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ সর্বসম(নিয়ে আসা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের দুজনকে ও আরো বহুসংখ্যক বিপ-বীকে অভিযুক্ত(করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ভগৎ সিং, বটুকে(্বর দত্ত, রাজগু(এবং সুখদেবের প্রাণদণ্ড হয়। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির পরে উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবে বিপ-বী আন্দোলনে যবনিকাপাত পড়ে যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। এর সর্বশেষ সংযোজন ছিল ১৯৪০ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও ডায়ারকে লন্ডনে হত্যা।

৪.৪.৬

বাংলাদেশেও এই সময় বিপ-বী আন্দোলনে পুন(জ্জীবন দেখা দেয়। পূর্বতন দুই প্রধান বিপ-বী সমিতি অনুশীলন ও যুগান্তরের পরিবর্তে কয়েকটি নতুন বিপ-বী সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার দ(ণ-পূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রাম জেলায় সূর্য সেন (মাষ্টারদা নামে সুপরিচিত) গড়ে তোলেন রিপাবলিক্যান আর্মি যাতে জড়ো হয় অদম্য সাহসী অকুতোভয় কিছু যুবক-যুবতী—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা, চত্র(বর্তী, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁরা আকস্মিক আত্র(মণ চালান অস্ত্রাগার, থানা ও পুলিশ ব্যারাক, ধ্বংস করেন রেল ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘোষণা করেন স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা। অন্ততঃ দুদিনের জন্য ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে শহরকে মুক্ত(করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে শেষপর্যন্ত লড়াই চালান পরাত্র(মশালী ব্রিটিশ সেনার বি(দ্ধে।

প্রায় একই সময়ে ঢাকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বা বি.ভি.) শক্তি(শালী বিপ-বী গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাংলা সরকারের প্রধান কার্যালয় রাইটার্স বিল্ডিংসে ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধে তিনজন নেতৃস্থানীয় বি. ভি. কর্মী বিনয়-বাদল-দীনেশ হত্যা করেন কারা বিভাগের আই. সি. সিম্পসনকে। ঘটনাস্থলেই বাদলের মৃত্যু হয়। বিনয় মারা যান কয়েকদিন বাদে, দীনেশের বিচারের পর ফাঁসি হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অলিন্দ যুদ্ধ ছাড়াও আরো কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা এই সময়ে ঘটেছিল। ১৯৩১-৩৩ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার পর পর তিনজন জেলাশাসককে হত্যা করেন বি. ভি. কর্মীরা এবং কলকাতা বি(বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহিলা বিপ-বী বীণা দাস বাংলার গভর্নরকে হত্যা করার এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

৪.৪.৭ উপসংহার

এই তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্বের বিপ-বী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হল যে, ভগৎ সিং এবং সূর্য সেনের মত নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধু ব্যক্তি(গত সন্ত্রাসের দ্বারা দেশকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত(করা যাবে না(কিন্তু এই ধরনের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ দেশে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে যা জনজাগরণ ও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথ প্রশস্ত করবে। দ্বিতীয়ত, ভগৎ সিং ভারতীয় বিপ-বীদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম যিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং মার্কসবাদের কিছু মৌলিক ধারণা গ্রহণ করেন। সূর্য সেনের অনুগামীদেরও অধিকাংশ যাঁরা জালানাবাদ যুদ্ধের পর জীবিত ছিলেন অধিকাংশ মার্কসবাদী চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩০-এর দশকের পর থেকে সশস্ত্র বিপ-বী আন্দোলনের মোটামুটি পরিসমাপ্তি ঘটে। জেলের ভিতরে ও বাইরে অধিকাংশ বিপ-বী কর্মীই বামপন্থী ও মার্কসবাদী চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ভারতীয় রাজীনীতির ইতিহাসে এটি একটি গুরত্বপূর্ণ বাঁক।

কাজেই সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, ইতিহাসের এক সন্ধি(ণে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীরা এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধ্যাপক সুমিত সরকার যথার্থই বলেছেন যে, তাঁদের ব্যর্থতা ছিল সাহসী ও গৌরবদীপ্ত। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অহিংস গণআন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ-বী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল ভারতের জাতীয় সংগ্রামের পরস্পর পরিপূরক দু'টি ধারা। তাছাড়া, এই বিপ-বী আন্দোলনের পথ বেয়েই ভারতে মার্কসবাদী ধারণার প্রসার ও সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটে।

৪.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্র(

১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের সম্পর্ক (১৯২০-৪৭) বি(-ষণ কর।

২। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কৃষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল? (১৯২০-৪৫)।

৩। দুই বি(বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ভারতের জাতীয় মুক্তি(আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ-বীদের অবদান আলোচনা কর।

সংি(প্ত প্র(

১। সারা ভারত কিষাণ সভার উদ্ভবের বিবরণ দাও।

২। ভারতের শিল্প শ্রমিকের স্বাধীনতা আন্দোলনে কতটা জড়িত ছিল।

৩। ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র বিপ-বীরা কতটা ভারতের মুক্তি(আন্দোলনে সাহায্য করতে পেরেছিলেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। ফিকির পুরো নাম কী?

২। সারা ভারত কিষাণ সভার প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

৩। ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪। বাঘা যতীন কে?

৫। প্রথম প্রবাসী অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের প্রধান কে ছিলেন?

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। Markovits Claude — Indian Business and Nationalist Politics, 1931-39 (Orient Longman).

২। Sen Sukomal—Working Class of India : History of Emergence and Movement, 1830-1970 (K.P. Bagchi, Kolkata).

৩। Dhanagare D. N.—Peasant Movements in India, 1920-1950 (O.U.P.).

৪। Bandyopadhyay Sekhar — From Pleassey to Partition : A History of Modern India (Orient Longman).

৫। Chandra Bipan, Tripathi Amales and De Barun—Freedom Struggle (National Book Trust).

ইতিহাস (স্নাতকোত্তর পাঠত্র(ম)
তৃতীয় পত্র ঃ পর্যায় - ৩

একক ১ ❑ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ

গঠন ঃ

১.০ উদ্দেশ্য-সমূহ
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫ বা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫
১.৩ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন
১.৪ (মতায় কংগ্রেস ঃ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কাজকর্ম
১.৫ সূত্র নির্দেশ
১.৬ অনুশীলনী
১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য-সমূহ

এই এককের উদ্দেশ্য হল ঃ

- বিশেষত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক আইনসভা, ভারতে তার রাজনৈতিক প্রতিত্রি(য়া ও সমালোচনার পরিপ্রে(িতে তার ধারাগুলিকে তুলে ধরে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের প্রচ্ছন্ন বিপদগুলি হৃদয়ঙ্গম করা(
- কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রকৃতি এবং গু(ত্ব উপলব্ধি করা(
- কংগ্রেসকে (মতায় নিয়ে আসা ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে বিচার করা।

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককে ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসের এক গু(ত্বপূর্ণ অধ্যায়, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া, এই এককে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন এবং বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কাজকর্মকেও অন্তর্ভূক্ত(করা হয়েছে।

১.২ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বলবৎ হওয়ার দশ বছর পর এক পর্যালোচনার সংস্থান রাখা হয়েছিল। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশনের নিযুক্তি(দিয়ে শু(এই দীর্ঘ ও জটিল প্রত্রি(য়া অবশেষে ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শুধুমাত্র দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩২ সাল থেকে সংবিধান প্রণয়নের ে ত্রে প্রকৃত ভারতীয় ভূমিকা যৎসামান্য হয়ে পড়ে**। ১৯৩২ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ও শেষ গোল টেবিল বৈঠকে মাত্র ৪৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ১৯৩১ সালে তাঁদের সংখ্যা ছিল ১১২।

গোলটেবিল বৈঠক নিজের দায়িত্ব পালন করার পর ব্রিটিশ সরকার তার প্রস্তাবগুলিকে সূত্রায়িত করে এবং ''ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব'' (Proposals for Indian Constitutional Reform) শীর্ষক একটি শ্বেতপত্রে (white paper) সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত(করে, যা ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রস্তাবগুলির পরিপ্রে(তে ভারতের ভবিষ্যৎ সরকার সম্পর্কে বিবেচনা করতে লর্ড লিনলিথগোর নেতৃত্বে (এপ্রিল, ১৯৩৩) পার্লামেন্টের উভয় ক(র এক সংযুক্ত(কমিটি নিযুক্ত(করা হয়। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে পেশ করা এই রিপোর্ট মোটামুটিভাবে ওই প্রস্তাবগুলির মূল বক্ত(ব্যগুলিকে অনুমোদন করে। এই রিপোর্ট ও শ্বেতপত্রের ভিত্তিতেই রচিত হয় ভারত সরকার বিল বা গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বিল, যা ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে (ভারত-বিষয়ক সেক্রে(টারি অফ স্টেট বা ভারত সচিব) স্যার স্যামুয়েল হোর হাউস অফ কমন্সে পেশ করেন। কোনও বড়ো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই বিলটি ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট অনুমোদন লাভ করে। নির্বাচন কেন্দ্রগুলির সীমা নির্ধারণ ও অর্থ বরাদ্দ করার নীতি সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে গঠিত দুটি কমিটি ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে তাদের রিপোর্ট পেশ করে।

এই শ্বেতপত্র ও তার সঙ্গে সংযুক্ত(কমিটির রিপোর্টটিও ভারতে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে যে এই শ্বেতপত্র তাদের প্রত্যাশা পূরণ তো করেইনি, বরং তার দিকে অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের জাতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রাজেন্দ্র প্রসাদ শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত সমালোচনা করেন।

আইনের ধারাগুলি

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ দুটি প্রধান বিষয়ে বিভক্ত(ঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও 'ভারতীয় যুক্ত(রাষ্ট্র' (Federation of India)।

এই আইন অনুযায়ী এক ''ভারতীয় যুক্ত(রাষ্ট্র'' গঠনের কথা হয়, যার অন্তর্ভুক্ত(হবে গভর্নর বা রাজ্যপাল-শাসিত প্রদেশগুলি। 'ইনস্ট্রুমেন্টাল অফ্ অ্যাকশেসনের' (Instruments of Accession) মাধ্যমে এতে যোগ দেবে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি (princely states) এবং চিফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলি। আইনত সবকটি নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির যুক্ত(রাষ্ট্রে যোগদান করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

কিং-এমপারার বা সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে যুক্ত(রাষ্ট্রের নির্বাহিক প্রাধিকার (executive authority) গভর্নর-জেনারেলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কার্য নির্বাহ করবেন একটি মন্ত্রীসভার সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে, যে মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁর ইচ্ছার উপর। অবশ্য কোনও কোনও ে ত্রে তাঁকে তাঁর 'নিজস্ব বিবেচনা', এবং অন্য কয়েকটি ে ত্রে 'ব্যক্তি(গত বিচার' প্রয়োগ করতে হত। প্রথম ে ত্রটিতে মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়াই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয়টিতে মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেও তা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। এ ছাড়া, চারটি বিষয়ে তাঁর ব্যক্তি(গত দায়িত্ব ছিল ঃ প্রতির(া, যাজক বা গীর্জা সংক্র(ান্ত বিষয়, বিদেশিক সম্পর্ক

** ১৯৩২ সাল থেকে সংবিধান প্রনয়নের ে ত্রে ভারতীয়দের অনীহা দেখা যায়।

(যুক্ত(রাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের কোনও অংশের মধ্যে সম্পর্ক ছাড়া) ও জনজাতি বা আদিবাসী-সংক্র(ান্ত বিষয়। তাঁরই নিযুক্ত(কৌঁসুলি বা পরামর্শদাতাদের সাহায্য নিয়ে তিনি এই বিষয়গুলি দেখাশোনা করতেন। এছাড়া, তিনি একজন আর্থিক উপেদষ্টা নিয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। আবার নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের (ে ত্রে তিনি মন্ত্রীসভার মাধ্যমে কাজ করা গভর্নর-জেনারেল নয়, সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতেন।

যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলের (Federal Legislature) দুটি ক(ছিল। রাজ্যসভার (council of states) সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০ এবং যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভার (Federal Assembly) সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭৫। রাজ্য সভা এবং যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভাতে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যা যথাত্র(মে ১০৪ ও ১২৫-এর বেশি হত না। জনগণ নয়, এই প্রতিনিধিদের মনোনয়ন করতেন তাঁদের শাসকরা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলিতে নির্বাচনী ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর (separate electorates) নীতি। দুটি ক(ে র (মতা প্রায় সমান সমান হলেও আর্থিক বিষয়ে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভার আধিপত্য ছিল বেশি।

তিনটি বিধান বিষয়ক তালিকার মাধ্যমে যুক্ত(রাষ্ট্র ও তার অঙ্গগুলির বিধান বিষয়ক (মতার প্রভেদ নির্দেশ করা হয়। এক নম্বর তালিকাভুক্ত(বিষয়গুলি, অর্থাৎ প্রতির(া, বিদেশনীতি, রেল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের (মতা একচেটিয়াভাবে ন্যস্ত করা হয় যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভার হাতে। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি দুই নম্বর তালিকাভুক্ত(বিষয়গুলি অর্থাৎ, আইন-শৃঙ্খলা, স্থানীয়-স্বায়ত্তশাসন, শি(া, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার পায়। তিন নম্বর তালিকাভুক্ত(বিষয়গুলি, যেমন ফৌজদারি বিধি, চুক্তি(বা ঠিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিষয়ে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভা ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি সমবর্তী বা যুগ্ম (মতার অধিকারী হয়। আইন প্রনয়নের (ে ত্রে গভর্নর-জেনারেলকে কিছু বিশেষ (মতা দেওয়া হয়।

মৌলিক এক্তি(য়ার, আপিল ও পরামর্শের অধি(ে ত্রে একটি যুক্ত(রাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার সংস্থান রাখা হয়। মৌলিক এক্তি(য়ারের (ে ত্রে এই আদালতের বিচারে আসে নিম্নলিখিত যে কোনও দুটি বা তার অধিক প(ে র বিবাদ ঃ যুক্ত(রাষ্ট্র, যে কোনও একটি প্রদেশ ও যুক্ত(রাষ্ট্রে যোগদানকারী যে কোনও নৃপতি-শাসিত রাজ্য। এখানে উচ্চ আদালত বা হাইকোর্টের আপিলগুলি শোনা হয়। আইন সংক্র(ান্ত বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল কোনও পরামর্শ চাইলে এই আদালত সেই বিষয়ে উপদেশ দেয়। এই আদালতের কোনও সিদ্ধান্তের বি(দ্ধে আপিল করলে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে যেতে হয়।

রেল যোগাযোগ পরিচালনার উদ্দেশ্যে এক 'ফেডারাল রেলওয়ে অথরিটি' বা 'যুক্ত(রাষ্ট্রীয় রেল সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কোনও সময়ে যদি গভর্নর জেনারেল মনে করেন যে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় সরকার আইনের ধারাগুলি মেনে শাসন চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে, সে(ে ত্রে (গভর্নর-জেনারেল) তিনি ঘোষিত আদেশের মাধ্যমে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় আদালত ছাড়া অন্য যে কোনও যুক্ত(রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের যে কোনও (মতা নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন।

ভারতসংক্র(ান্ত বিষয়ে রাজশক্তি(র সমস্ত কর্তৃত্বের অনুশীলনের ল(্যে সেক্রে(টারি অফ স্টেট রাজশক্তি(র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে থাকেন। অন্যান্য (মতা ছাড়াও তাঁকে গর্ভনর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেওয়া হয়, বিশেষত যখন তাঁরা তাঁদের 'নিজস্ব বিবেচনা' বা 'ব্যক্তি(গত বিচার' প্রয়োগ করতে শু(করেন। তাঁর পরিষদের জায়গায় এক 'উপদেষ্টা মণ্ডলী' গঠন করা হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

এই আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত(করা হয় ঃ এগারোটি গভর্নর বা রাজ্যপালের প্রদেশ (মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, সংযুক্ত(প্রদেশ বা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স, উড়িষ্যা, সিন্ধু) এবং পাঁচটি চিফ কমিশনার বা মুখ্য মহাধ্য(র প্রদেশ (ব্রিটিশ বালুচিস্তান, আজমীর-মেরয়াড় কুর্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পন্থ পিপলোডা)। যুক্ত(রাষ্ট্রের নির্বাহিক ও বিধান বিষয়ক কর্তৃত্ব মুখ্য কর্মাধ্য(র প্রদেশগুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়— তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয় না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় শুধুমাত্র গভর্নরের প্রদেশগুলি।

যুক্ত(রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেও গভর্নরের প্রদেশগুলি তাদের (মতা ও কর্তৃত্ব পায় সরাসরি রাজশক্তি(বা ক্র(াউন থেকে, আগের মত ভারত সরকারের কাছ থেকে নয়। এই প্রথম তারা এক পৃথক আইনী সত্ত্বা অর্জন করে। একান্তভাবে কোনও প্রাদেশিক বিষয়ে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় সরকার ও যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভার কোনও আইনী (মতা বা কর্তৃত্ব থাকবে না, যদিও কোনও কোনও (ত্রে গভর্নর জেনারেল নিজে গভর্নরদের উপর নজর রাখতে পারবেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কোন কোন (ত্রে কার্যকর হবে, তা তিনটি বিধান বিষয়ক তালিকাতে বিধান বিষয়ক (মতার বণ্টনের মধ্যেই নির্দেশ করা হয়। প্রদেশগুলির নির্বাহিক (মতা তাদের বিধান বিষয়ক (মতার মতই সমব্যাপী হবে।

সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নরের হাতে প্রদেশের নির্বাহিক কর্তৃত্ব থাকবে। তিনি একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন যার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁর ইচ্ছার উপর। দ্বৈতশাসনের বিলুপ্তির ফলে মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে সমব্যাপী (Co-extensive) হয়ে যায়। কোনও নির্বাহী পরিষদ থাকে না ও 'সংর(িত' বিষয় থাকে না। কিন্তু গভর্নরের হাতে থাকা বিশেষ (মতাগুলি মন্ত্রীদের (মতা খর্ব করে তোলে।

কোনও কোনও বিষয়ে গভর্নরের 'বিশেষ দায়িত্ব' থাকে, যেখানে তিনি তাঁর 'ব্যক্তি(গত বিচার' প্রয়োগ করতে পারেন, অর্থাৎ মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন, 'শান্তি ও সুস্থিরতার (ত্রে কোনও মারাত্মক বিপদ দেখা দিলে তা নিবারণ করা', 'সংখ্যালঘুদের আইনসঙ্গত স্বার্থ'গুলি র(া করা, 'বর্হিভূত' ও 'আংশিক বর্হিভূত' অঞ্চলগুলির প্রশাসন চালানো, এবং বৈষম্য ইত্যাদির বি(দ্ধে আইনগুলি কার্যকরী করতে নির্বাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত(। এ ছাড়া পুলিশের নিয়মকানুন, কর্মচারীদের পদোন্নতি বা শাস্তি ইত্যাদি কয়েকটি (ত্রে তিনি তাঁর 'ব্যক্তি(গত বিচার' প্রয়োগ করার (মতাধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক বিধানসভার অধিবেশন ডাকা, প্রাদেশিক বিধানসভায় অনুমোদিত কোনও বিলে সম্মতি দেওয়া, অধ্যাদেশ জারী করা, পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা জন কৃত্যক আয়োগের সদস্য নিয়োগ ইত্যাদি (ত্রে মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ না করেই তিনি তাঁর 'নিজস্ব বিবেচনা' অনুযায়ী কাজ করতে পারতেন। 'নিজস্ব বিবেচনা' বা 'ব্যক্তি(গত বিচার', এই দুই (ত্রেই তিনি গভর্নর -জেনারেলের 'সাধারণ নিয়ন্ত্রণের' অধীন ছিলেন।

আগের মতোই বিভাগীয় সচিবেরা (যারা প্রতিটি (ত্রেই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ সদস্য ছিলেন) সরাসরি গভর্নরের কাছে পৌঁছোতে পারতেন। এর অর্থ তিনি আমলাতন্ত্রকে মন্ত্রীমণ্ডলীর থেকে বেশি বি(াসযোগ্য মনে করতেন।

এই আইনের এত নম্বর ধারাতে গভর্নরকে এই (মতা দেওয়া হয় যে তিনি যদি কোনও সময় মনে করেন যে প্রদেশের সরকার আইনের ধারাগুলি মেনে কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তিনি ঘোষিত আদেশের মাধ্যমে উচ্চ আদালত ছাড়া সব বা যে কোনও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন।

প্রাদেশিক বিধানমণ্ডল

মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, সংযুক্ত(প্রদেশ, বিহার, আসাম—এই ছ'টি প্রদেশে বিধানমণ্ডলের দু'টি ক(থাকে ঃ বিধান পরিষদ ও বিধান সভা। বাকী অন্যান্য প্রদেশগুলিতে শুধু একটি ক(, অর্থাৎ বিধান সভা থাকার সংস্থান করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিধান পরিষদগুলিতে সদস্য সংখ্যা ৬৫ এবং ২১-এর মধ্যে থাকে। এদিকে বিভিন্ন প্রদেশের বিধান সভাগুলিতে এই সংখ্যা ২৫০ থেকে ৫০-এর মধ্যে ঘেরাফেরা করে। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর নীতির ভিত্তিতে আসন বরাদ্দের পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়। বিধান পরিষদের (মতা বিধান সভার সমবিস্তৃত ছিল না— বিধান পরিষদ শুধু সংশোধন ও বিলম্ব করার (মতা পেয়েছিল। গভর্নরের বিভিন্ন ধরনের বিধান বিষয়ক (মতা ছিল, যার মধ্যে পড়ে অধ্যাদেশ জারী করা এবং 'বর্হিভূত অঞ্চল' ও 'আংশিক বর্হিভূত অঞ্চলের' শান্তি ও সুশাসনের জন্য নিয়মকানুন স্থির করা। বিধানমণ্ডলে অনুমোদিত কোনও বিলে তিনি সম্মতি জানাতে পারতেন, সম্মতি দেওয়া স্থগিত রাখতে পারতেন, পুর্নবিবেচনার জন্য বিধানমণ্ডলে ফেরত পাঠাতে পারতেন, অথবা গভর্নর জেনারেলের বিবেচনার জন্য রেখে দিতে পারতেন।

এক সাধারণ নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীকে এই নম্বর তালিকাভুক্ত(সব বিষয়ে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর সঙ্গে যুগ্মভাবে আইন প্রনয়নের (মতা দেওয়া হয়েছিল। তিন নম্বর তালিকাভুক্ত(সব বিষয়ে আইন প্রনয়নের অধিকারও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলী পেয়েছিল।

যুক্ত(রাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে রাজত্বের উৎস বরাদ্দ করা যুক্ত(রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এক আবশ্যিক পরিণাম ছিল। এই আইনের সুপারিশ করা ব্যবস্থা প্রাদেশিক রাজস্বের জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯১৯ সালের আইনের তুলনায় এই ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। এর ফলে যুক্ত(রাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আরও ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হয়েছিল। জিন্না ও কংগ্রেস তো বটেই, প্রায় সকল শ্রেণির ভারতীয় জনগণ এই আইনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিল।

ভারতে রাজনৈতিক প্রতিত্রি(য়া

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই নতুন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নি(ত করেন। প্রথমত যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডল প্রকৃতপ(দেশের প্রতিনিধি নয় কারণ রাজ্যগুলি থেকে যে সব সদস্যদের পাঠানো হয়েছে তাঁরা তাঁদের শাসকদের মনোনীত, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। ''ভারতের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলের শাসকরা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলের নির্বাচিত, প্রগতিশীল প্রতিনিধিদের সমস্ত প্রয়াসের বিরোধিতা করবেন। দ্বিতীয়ত, জনগণের কাছে (মতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে না কারণ গভর্নর-জেনারেল ও গভর্নরদের হাতে বিশেষ (মতা দেবার ফলে বহু (ত্রেই জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে গেছে। তৃতীয়ত, যুক্ত(রাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়ের আশি শতাংশের জন্য কোনও ভোটের প্রয়োজন হবে না, যা যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলের কর্তৃত্বকে গু(তরভাবে খর্ব করবে। চতুর্থত, স্বায়ত্তশাসনের বিকাশের কোনও সংস্থান রাখা হয়নি, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার কোনও ভনিতা করা হয়নি।'' এই আইনকে 'দাসত্বের ফরমান' হিসাবে বর্ণনা করে পণ্ডিত জহরলাল নেহ(একে ভারতীয় নৃপতি, জমিদার ও প্রতিত্রি(য়াশীল শক্তি(গুলির তোষণ বলে সমালোচনা করেন। প্রকৃতপ(এই আইন ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, সংর(ি ত ও হস্তান্তরিত বিষয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংত্র(ান্ত ধারাগুলির কোনওটিই ভারতের জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ও আকাঙ্খাগুলিকে প্রতিফলিত করে না। কাজেই, এই আইনের প(ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করার কোনও প্র(ওঠে না।

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিধানসভাতে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে ''মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অগ্রহণীয়'' এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ''সর্বাপে(া অ-সন্তোষজনক ও দুঃখজনক'' হিসাবে বর্ণনা করে এক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এটি সম্ভব হয় কংগ্রেস এবং মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগের সমঝোতার ফলে। ''সম্পূর্ণত নষ্ট, মন্দ ও অগ্রহণীয়'' বলে বর্ণনা করে জিন্না ১৯৩৫ সালের এই আইনের কঠোর সমালোচনা করেন।

যুক্ত(রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বি(দ্ধে জিন্নার এই সমালোচনা ছিল কুণ্ঠাহীন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি (যাদের বেশিরভাগই যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীতে হিন্দু প্রতিনিধি পাঠাবে) কেন্দ্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। বর্তমান ব্যবস্থার থেকে উন্নততর বলে আখ্যা দিলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনাতে বেশ কিছু আপত্তিজনক বৈশিষ্ট্য আছে বলে জিন্না মনে করেন। তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন কারণ এর ফলে বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু—এই চারটি প্রদেশ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসবে। প্রস্তাবিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা জাতীয় স্তরে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে কীভাবে আঘাত করবে সে কথা না চিন্তা করে তিনি একে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিচার করেন।

সমালোচনা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তীব্র বিতর্কের পর ১৯৩৫ সালের এই আইন পাশ হলেও শুধুমাত্র প্রদেশগুলি এর ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়। প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে এক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ষাট ল(থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিন কোটিতে পৌঁছোয়। কিন্তু গভর্নরদের হাতে স্ব-বিবেচনার (মতা থেকে যায়। এই (মতাবলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে ডাকা, বিলে সম্মতি দেওয়া এবং কিছু বিশেষ অঞ্চল (প্রধানত আদিবাসী বা জনজাতি) শাসন করার অদিকার পান। এই সব (ে ত্রে মন্ত্রীসভার কোনও চরম উপদেশ দেবার অধিকার থাকে না। সংখ্যালঘুর অধিকার, প্রশাসনিক কর্মীদের বিশেষাধিকার ও ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের বিরদ্ধে বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে গভর্নরদের 'নিজস্ব বিচার' প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়— এ(ে ত্রে মন্ত্রীসভা উপদেশ দিলেও তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক থাকে না। এ ছাড়া, ১৯৩৫ সালের আইনের কুখ্যাত ৯৩ ধারা অনুযায়ী গর্ভনর যে কোনও প্রদেশের শাসনভার অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন। প্রস্তাবিত যুক্ত(রাষ্ট্রীয় কাঠামো, যা কার্যকরী হবার কথা পঞ্চাশ শতাংশ নৃপতিরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে যোগ দেবার পর— সেই কাঠামো মোটামুটি শক্তি(শালী এক কেন্দ্রের প্রশাসনে এক ধরনের দ্বৈতশাসনের জন্ম দেয়। নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলি প্রদেশগুলিতে চালু করা 'র(াকবচের' অধীনে থাকে, এদিকে বিদেশনীতি ও প্রতির(ার বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে ভাইসরয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে। নতুন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক ও রেলওয়েজকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিধানসভা নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়। ঋণকৃত্যকে (debt services) এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বেতনকেও সংর(িত বিষয় হিসাবে রাখা হয় এবং মুদ্রা ও বিনিময় সংত্র(ান্ত কোনও আইন প্রনয়নের জন্য ভাইসরয়ের পূর্বসম্মতির প্রয়োজন হয়। এটা সত্য যে এই আইনের ফলে চূড়ান্ত আর্থিক নিয়ন্ত্রণ লন্ডন থেকে নয়াদিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল— যা টমলিনসনের মত কিছু সমকালীন ইতিহাসবিদ জোরের সঙ্গে দাবি করেন। কিন্তু সেত্রে(টারি অফ স্টেট থেকে ব্রিটিশ সরকারেরই নিযুক্ত(এক ভাইসরয়ের হাতে (মতা স্থানান্তরের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। দ্বিক(বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীতে নৃপতিদের মনোনীত সদস্যেরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ আসনের অধিকারী ছিলেন (রাজ্যসভাতে ২৭৬টির মধ্যে ১০৪ যুক্ত(রাষ্ট্রীয় বিধানসভাতে ৩৭৫টির মধ্যে ১২৫)। এদিকে পুনা প্যাক্টের দ্বারা সংশোধিত

ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ডকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত(করার ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে মুসলিমরা ও অন্যান্য বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এই আইনের আরও বিপজ্জনক একটি ধারা হল রাজশক্তি(বা ত্র(াউনের সঙ্গে ভারতীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের বিষয়টি 'রাজশক্তি(র প্রতিনিধি', কার্যত ভাইসরয়ের হাতে স্থানান্তর করা, যে ভাইসরয় দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের মাধ্যমে নয়, বরং পুরোপুরি সরকারি রাজনৈতিক বিভাগ, স্থানীয় অধিবাসী এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্যনির্বাহ করেন। ১৯৩৫ সালের আইনের যুক্ত(রাষ্ট্রীয় অংশটি অবশ্য যাত্রা শু(ই করতে পারেননি, কারণ আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার দখলের সম্ভাবনা সম্পর্কে নৃপতিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ ছাড়া, যুক্ত(রাষ্ট্রে সংযোজিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশদের একাধিপত্যের দাবি হ্রাস করায় অনীহা তাদের আরও নি(ৎসাহ করে তোলে। মুসলিম রাজনৈতিক নেতারাও মনে করতে থাকেন, যে প্রস্তাবিত যুক্ত(রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি বড়ো বেশি মাত্রায় সমতাধর্মী এবং এর ফলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কর্তৃত্বের বিপদের মুখোমুখি হতে পারেন। এদিকে কংগ্রেসের সব শ্রেণিই এই প্রস্তাবিত যুক্ত(রাষ্ট্রকে এক প্রতারণা আখ্যা দেয়। এই অচলাবস্থায় ব্রিটিশরা অবশ্য তেমন অখুশি হয় না, কারণ এর ফলে তারা ১৯২৯ সালের কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের (মতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বজায় রাখতে স(ম হয়। এখানে একথা উল্লেখ করা গু(ত্বপূর্ণ যে, ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসের বহু কথিত আরউইন প্রস্তাবের ছয় বছর পরেও এই আইন অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion status) সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে, ব্রিটিশরা শেষে ভারতীয়দের হাতে কিছু প্রকৃত (মতা তুলে দিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশরা অতি কৌশলের সঙ্গে এই (মতাগুলিকে কিছু র(াকবচের বাঁধা দিয়ে ঘিরে রাখে। এই আইন অনুযায়ী প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর এই আইনের অগণতান্ত্রিক দিকগুলিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে বিরোধ বাধে। তবে যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক, ১৯৩৫ সালের এই আইন ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এক নতুন দিকের সূচনা করে। ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টির একথা নিশ্চিতভাবে পূর্বাভাষ দেয় যে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ত্র(মশ আরও শক্তি(শালী হয়ে উঠবে।

১.৩ কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

১৯৩২ সালের ১৬ই আগস্ট যখন কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও আইন অমান্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য দলের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও কিছু অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেই সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এক ঘোষণা করেন যা 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' বা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই বাঁটোয়ারার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতিই প্রতিফলিত হয়। এই রায়ে প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিধানমণ্ডলীগুলিতে কিছু আসন বরাদ্দ করা হয় যেগুলিতে নির্বাচন হতে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর ভিত্তিতে। অর্থাৎ মুসলিমরা নির্বাচিত হবেন মুসলিমদের দ্বারা, শিখরা শিখদের দ্বারা ইত্যাদি। মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু হিসাবে দেখা হত। এই রায়ে তফশিলি সম্প্রদায়কেও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে ঘোষণা করা হল এবং এইভাবে বাকি হিন্দুদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হল।

কংগ্রেস মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের জন্য এই ধরনের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিল, কারণ এর দ্বারা এক সাম্প্রদায়িক ভাবনাকেই উৎসাহ দেওয়া হত যে তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যাদের স্বার্থ সাধারণ ভারতীয় স্বার্থের থেকে আলাদা। এর অবধারিত ফল হল ভারতীয় জনগণকে বিভাজিত করে দেওয়া এবং এক

সাধারণ জাতীয় চেতনার বিকাশকে (দ্ধ করে দেওয়া। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার এক সঙ্গে হিসাবে কংগ্রেস ১৯১৬ সালেই মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কাজেই তখন কংগ্রেস এই অবস্থান নিল যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী হলেও তারা সংখ্যালঘুদের সম্মতি ছাড়া রায় পরিবর্তনের প(পাতী নয়। এর ফলে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র বিরোধিতা করলেও কংগ্রেস একে গ্রহণ বা বর্জন, কোনওটিও না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু তফশিলি সম্প্রদায়কে পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করে বাকি হিন্দুদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার এই প্রয়াস জাতীয়তাবাদীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ইয়ারাভাদা জেলে বন্দি গান্ধিজি বিশেষত এর তীব্র প্রতিবাদে আমরণ অনশনে শু(করেন। তাঁর কাছে সরকারের এই পরিকল্পনা এক ষড়যন্ত্র মনে হয়। তিনি এই বাঁটোয়ারাকে ভারতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের বি(দ্ধে এক আত্র(মণ হিসাবে দেখেন যা হিন্দু ধর্ম ও তফশিলি সম্প্রদায়, উভয়ের প(ই (তিকর। কারণ এই রায় তফশিলি সম্প্রদায়ের সামাজিক অমর্যাদার সমস্যার কোনও সমাধান তুলে ধরে না। তফশিলি সম্প্রদায়কে পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে দেখতে শু(করা মাত্র অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির প্র(টি আর উঠবে না এবং এই বিষয়ে হিন্দু সামাজিক সংস্কারের কাজ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

গান্ধিজির বক্ত(ব্য ছিল, পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী মুসলিম বা শিখদের যতই (তি ক(ক, তারা মুসলিম বা শিখই থেকে যাবে। কিন্তু তাঁর মত সংস্কার করা যখন অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ অবসানের জন্য কাজ করছেন, তখন পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী অস্পৃশ্যদের চিরদিন অস্পৃশ্যই থেকে যাবে।' বিধানমণ্ডলীতে আসন বা চাকরির মাধ্যমে তফশিলি সম্প্রদায়ের তথাকথিত স্বার্থর(া নয়, প্রকৃত প্রয়োজন হল অস্পৃশ্যতাকে আমূল উচ্ছেদ করা।

গান্ধিজি দাবী করেন যে, তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হোক আরও বিস্তৃত, সম্ভব হলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে এক অভিন্ন, সাধারণ নির্বাচনের সাহায্যে। একই সঙ্গে তিনি তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি সংর(ত আসনের দাবির বি(দ্ধে কোনও আপত্তি প্রকাশ করেননি। তাঁর দাবি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর আমরণ অনশন শু(করেন। সংবাদপত্রগুলিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''আমি আমার নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করি না। তাদের নিজেরই ধর্মের অসহায় নরনারীদের উপর হিন্দুরা যে জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে, আমার মতে এই মহৎ উদ্দেশ্যে একশো জীবন উৎসর্গ করা হলেও যথেষ্ট পাপস্খালন হবে না।''

বহু রাজনীতি-সচেতন ভারতীয় এই অনশনকে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মনে করলেও সকলেই এই বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বেগান্বিত হয়ে পড়েন। প্রায় সর্বত্রই বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বরের দিনটি অনশন ও প্রার্থনার দিন হিসাবে পালন করা হয়। দেশজুড়ে মন্দির, জলাশয় ইত্যাদি তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য খুলে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে এক টেলিগ্রাম পাঠান। গান্ধিজির স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতারা, যেমন মদন মোহন মালব্য, এম সি রাজা, বি. আর. আম্বেদকর, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, সি. রাজাগোপালাচারী তখন সত্রি(য় হয়ে ওঠেন। শেষে তারা 'পুনা প্যাক্ট' নামে পরিচিত এক চুক্তি(সম্পাদন করতে সফল হন, যে চুক্তি(অনুযায়ী তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভাবনাটি পরিত্যাগ করা হবে কিন্তু তাদের জন্য সংর(ত আসনের সংখ্যা প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলীগুলিতে ৭১ থেকে বাড়িয়ে ১৪৭ এবং কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীতে মোট আসনের ১৮ শতাংশ করা হবে। তফশিলি সম্প্রদায় সমেত সব হিন্দুদের জন্য এক অভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলী গড়া হবে। তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের

---

* গৃহীত হয়েছে।

প্রশাসন কৃত্যকে প্রতিনিধিত্বের বিশেষ সংস্থান করা হবে। তাদের শি(ার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দশ বছরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শেষে ১৯৩২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর গান্ধিজি তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন।

১.৪ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন

১৯৩৫ সালের আইন রূপায়ন

যুক্ত(রাষ্ট্র ও যুক্ত(রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে কর্তৃপ(সংক্র(ান্ত ধারাগুলি বাদ দিয়ে এই আইন ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। কোনও নৃপতি-শাসিত রাজ্য সংযোজনে সম্মত না হওয়ার ফলে প্রস্তাবিত যুক্ত(রাষ্ট্র গঠন করাই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সাধারণত বলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলী ১৯১৯ সালের আইনের ধারাগুলি অনুসরণ করেই কাজ করতে থাকে। প্রদেশ সংক্র(ান্ত ধারাগুলির প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের আইন ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে এবং তারপর (মতা হস্তান্তর হলে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন আনা হয়।

১৯৩৫ সালের আইনটি অনুমোদিত হবার পর মুসলিম লিগ নতুন প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলীগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৬) হিসাবে জহরলাল নেহ(বলেন যে এই আইনের প্রতি কংগ্রেস আপসহীন বিরোধিতা করে যাবে। একই সঙ্গে তিনি সুপারিশ করেন যে গণপরিষদের (Constituent Assembly) দাবিকে সামনে রেখে এক বিস্তারিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত। এইভাবে স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচি আবার নতুন করে জেগে ওঠে এবং কংগ্রেস তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে।

সবদিকে বিচার করলে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজয়কে দর্শনীয় বলা যেতে পারে। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১১টিতে জয়লাভ করে। কিন্তু ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৫৮টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ২৬টিতে জয়ী হয়। এর মধ্যে 'সীমান্ত গান্ধী' আবদুল গফ্ফর খানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একাই ১৯টি আসন দেয়। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নব-নির্বাচিত অ-কংগ্রেসি মুসলিম সদস্যরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(ছিলেন। জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ এই চারটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের একটিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি।

এর পরবর্তী পর্যায় হল মন্ত্রীসভা গঠন। চারটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম প্রধানমন্ত্রীদের নেতৃত্বে জোট মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। কংগ্রেস এই মন্ত্রীসভাগুলিতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। অ-মুসলিম প্রধান আসামেও মুসলিম প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক জোট মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

মাদ্রাজ, সংযুক্ত(প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা— এই পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বোম্বাইতে মোট আসনের প্রায় অর্ধেক দখল করে কংগ্রেস কিছু সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমর্থনের উপর নির্ভর করে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। আসাম এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস এক শক্তি(শালী গোষ্ঠী গঠন করতে স(ম হয়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতভেদকে কাজে লাগাতে পারে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাতে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোনও আশাই কংগ্রেসের ছিল না।

এই আইনের প্রতি 'আপসহীন বিরোধিতার' সঙ্গে এরই ধারাগুলি মেনে নিয়ে (মতা গ্রহণকে মেলানো সহজ ছিল না। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এ(ত্রে এক সমঝোতায় উপনীত হন ঃ আপসহীন বিরোধিতার নীতির কথা

পুনরাবৃত্তি করা হয়, কিন্তু গভর্নর তাঁর 'হস্তে(পের বিশেষ (মতা প্রয়োগ করবেন না, এই শর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা প্রদেশগুলিতে (মতা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।

এই শর্ত আরোপ করার ফলে অস্থায়ী এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ছয়টি প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীতে (মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত(প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ) গভর্নরেরা কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানালেও দল সেই আমন্ত্রণ অস্বীকার করে কারণ গভর্নরেরা শর্ত পালন করার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। গভর্নররা এখন 'অর্ন্তবর্তীকালীন' মন্ত্রীসভা নিযুক্ত(করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় আইন অনুযায়ী তারা ছয় মাসের বেশি (মতায় থাকতে পারে না। শেষে ভাইসরয়ের এক বিবৃতিতে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে লর্ড লিনলিথগো বলেন যে কোনও জ(রি পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ অনিবার্য না হলে গভর্নররা তাদের বিশেষ (মতা 'প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবেন। কংগ্রেস এই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হয়। এর ফলে 'অর্ন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীসভাগুলি' পদত্যাগ করে এবং ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেস তার বৈপ-বিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং জনগণের কাছে থাকতে এক সংসদীয় মনোভাব গ্রহণ করে।' জনগণের জন্য এই আইনের আওতায় থেকেও কিছু করা সম্ভব—এই ধারণা ত্র(মশ দানা বাঁধতে থাকে। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে আইন অমান্য তার আবেদন হারিয়ে ফেলে।

১.৫ (মতায় কংগ্রেস ঃ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কাজকর্ম

কংগ্রেসি প্রদেশ (১৯৩৭-৩৯)

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অ-কংগ্রেসী জোট মন্ত্রীসভার কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাকে বসানো হয়। এক বছর পরে কংগ্রেসের কর্মসূচি রূপায়ন করার লে(্যে আসামে কংগ্রেসের প্রাধান্য-সংকলিত এক মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে গঠিত সিন্ধের অ-কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের শর্তসাপে(সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইভাবে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে (মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত(প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) (মতায় আসে। আসামে প্রশাসন কার্যত কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সিন্ধে তার সমর্থন অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু দুটি প্রদেশ—বাংলা ও পাঞ্জাব কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক(পথের বাইরে থাকে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংযুক্ত(প্রদেশ ও বিহারে এক অস্থায়ী রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই দুই প্রদেশের গভর্নররা (একজন ভাইসরয়-সমর্থিত) রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত(করার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস গভর্নরদের এই আচারণকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয় এবং তার প্রতি ভাইসরয়ের সমর্থনকে ১৯৩৭ সালের জুন মাসে দেওয়া প্রতিশ্রুতির লঙঘন হিসাবে বর্ণনা করে। এই সংকটের অবসান হয় যখন দুই গভর্নর রাজনৈতিক বন্দিদের 'পর্যায়ত্র(মে মুক্তি(' দেবার আ(াস দেন। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা এখন তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কংগ্রেসি প্রদেশগুলিতে অন্য কোনও সংকট দেখা দেয়নি। কোথাও 'বিশেষ (মতা' প্রয়োগ করার আগে গভর্নররা তাদের মন্ত্রীদের সম্মতি আদায় করে নিতেন। বিধানমণ্ডলীগুলিতে কংগ্রেস সদস্যেরা সংসদীয় রীতি অনুয়ায়ী দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। কংগ্রেস 'হাই কমাণ্ড', অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটি ও

পার্লামেন্টারি বোর্ড সব কংগ্রেসি প্রদেশে উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম স্থির করত। এই হাই কমাণ্ড বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী স্থির করত, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী কে কে হবেন তা স্থির করত এবং প্রত্যেকের কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত।

ভারতীয় মন্ত্রীরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোটামুটি ভালোভাবেই কাজ করেন। নতুন আইনে গভর্নরদের দেওয়া বিশেষ ক্ষমতা মাত্র একবার প্রয়োগ করা হয়। কংগ্রেস সরকারগুলি ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণমূলক চরিত্রের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলেও ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর ভিতরেই তারা ভারতীয় জনগণের জন্য কিছু স্বাচ্ছন্দ্য দেবার প্রয়াস করেছিল। সব মিলিয়ে বিচার করলে, ভারতীয় ও ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার পর এই প্রথম বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই না করে প্রেস তার সঙ্গে সহযোগিতা করছিল।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির সামনে অনেকগুলি অসুবিধা ছিল। (১) কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত না। একদিকে 'পূর্ণ স্বরাজে'র প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে এত দিন যাদের বিরোধিতা করা হয়েছে সেই প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত রূপায়নের দ্বিচারিতা ছিল। কংগ্রেসকে ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতর কাজ করতে হত, যার ফলে কোনও মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল না। (২) সব থেকে গুরুতর সমস্যা ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। কংগ্রেসের শ্রেণিগত চরিত্র বহুমাত্রিক হবার ফলে তার পক্ষে একই সঙ্গে জমিদার ও কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব ছিল না। (৩) আর্থিক ক্ষেত্রে কড়াকড়ি প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে আর একটি প্রধান সমস্যা ছিল। ভারতের রাজস্বের সিংহভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এর ফলে যে সব ক্ষেত্রে নিয়মিত অর্থের যোগানের প্রয়োজন হত, অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির জন্য সরকার স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারত না। (৩) পার্লামেন্টারি সাব-কমিটি কংগ্রেসের নীতি প্রণয়নের দায়িত্বে থাকায় হাই কমান্ডের পূর্বসম্মতি ছাড়া মন্ত্রীসভা নতুন কোনও প্রকল্পের কাজ হাতে নিতে পারত না।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

১৯৩৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র সাতাশ মাসের ব্যবধানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কিছু দুঃসাধ্য কাজ করেছিল। (১) জাতীয়তাবাদের উত্থান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা কিছু দমনমূলক আইন প্রণয়ন করেছিল। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলি সেগুলির কয়েকটিকে বাতিল করে এবং বহু রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়। (২) রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিল, অর্থাৎ নাগরিকদের বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিল। (৩) নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুদখোরি-বিরোধী আইন ও প্রজাস্বত্ত্ব বিধি অনুমোদন করে কৃষকদের সাহায্য করেছিল। 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সময়ে কংগ্রেসের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে জমিদারি ও জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, কৃষি ঋণ মকুব করা এবং শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। (৪) বাস্তবেই প্রাথমিক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছিল। (৫) কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কর্মসূচিতে জনস্বাস্থ্য যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। (৬) কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণির মঙ্গলের জন্যও কাজ করেছিল। এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নতুন প্রেরণা পেয়েছিল। কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সব মিলিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। (৭) সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল হরিজন কল্যাণ, অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি,

মদ্যপান-বিরোধী অভিযান ইত্যাদি। (৮) কংগ্রেস সরকারগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মন্ত্রীরা তাঁদের মাসিক বেতন থেকে পাঁচশো টাকা কম নিতেন। তাঁরা ট্রেনে সাধারণ শ্রেণিতে যাতায়াত করতেন। সততা ও জনসেবার যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছিলেন, আজকের দিনে তা দুর্লভ। এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে সুমিত সরকার অবশ্য বলেন যে, ''হঠাৎ (মতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নাগাল পাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সুবিধাজনক স্থান অন্বেষণ ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মত কুফলগুলি দেখা দিয়েছিল।'' (৯) কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সব রকমের আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ১৯৩৬ সালে পাঁচ ল(ছিল। তা ত্র(মশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৭ সালে একত্রিশ ল(ও ১৯৩৮ সালে পয়ঁতাল্লিশ ল(্যে পৌঁছেছিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানির বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে।

অ-কংগ্রেসি প্রদেশ (১৯৩৭—৪৭)

পাঞ্জাবে স্যার সিকান্দার হায়াত খানের নেতৃত্বে (১৯৩৭—৪২) মুসলিম, হিন্দু ও শিখদের নিয়ে গঠিত 'ইউনিয়ানিস্ট' মন্ত্রীসভা অন্যান্য অ-কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার থেকে বেশি শক্তি(শালী ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। জিন্নার দেশভাগের দাবি হায়াত মন্ত্রীসভাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম লিগ ত্র(মশ ইউনিস্ট পার্টির মুসলিম অংশের উপর প্রভাব বৃদ্ধি করতে সফল হয় এবং সিকান্দার হায়াত খানের উত্তরাধিকারী খিজরি হায়াত খানের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে মন্ত্রীসভার শক্তি(হ্রাস পায়। মন্ত্রীসভা অবশ্য ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একটানা (মতায় থাকতে স(ম হয়।

বাংলাতে অবশ্য অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ, কোনও দলই বিধানসভাতে একক বৃহত্তম দল হয়ে উঠতে পারেনি। ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৬০, মুসলিম লিগ ৪০ ও কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন দখল করতে স(ম হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রাদেশিক হাই কমান্ড ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে জোট মন্ত্রীসভা গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আপত্তিতে এই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের জোট মন্ত্রীসভা মাঝে কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত গভর্নরের অসাংবিধানিক চাপে হক পদত্যাগ করা অবধি (মতায় থাকে। আইনের ৯৩ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে গভর্নর কিছু দিনের জন্য প্রশাসন নিজের হাতে তুলে নেন এবং পরে স্যার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে এক মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভাকে (মতায় বসানো হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত মুসলিম লিগ (মতা উপভোগ করে, কিন্তু এর মধ্যে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে এইচ এস সুহরাওয়ার্দি স্যার নাজিমুদ্দিনের স্থানাভিষিক্ত(হন।

এইভাবে মুসলিম লীগ তাদের পাওয়া রাজনৈতিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এই জোট মন্ত্রীসভা চলাকালীন মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব বেড়ে উঠতে থাকে এবং এর ফলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার জন্ম হয়। মন্ত্রীসভার বি(দ্ধেই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেবার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগকে পুঁজি করে মুসলিম লিগকে মন্ত্রীসভা থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিরোধিতায় তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সিন্ধু-তে (সিন্ধু প্রদেশ) বিভিন্ন নেতার অধীনে অনেকগুলি মন্ত্রীসভা পরপর (মতায় আসীন হয়। আল্লা বখ্স নামে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ এক প্রধানমন্ত্রীকে গভর্নর বরখাস্ত করেন।

ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা এবং আল্লা বখ্সকে বরখাস্ত করা— এই দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে ইচ্ছা করলে 'গভর্নররা ১৯৩৫ সালের আইনকে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে (মতার অপব্যবহার মুসলিম লিগের প্রতি তাঁদের অনুরাগকে প্রকাশ্যে এনে ফেলেছিল।

কংগ্রেসের 'বাংলা শাখা তখন গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু। ত(ণ প্রজন্মের বেশিরভাগ সদস্যরাই এই অংশের প্রতি অনুরত্ত(ছিল। অন্যদিকে র(ণশীল গান্ধিবাদী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে র(ণশীল দ(ণপন্থীদের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায় যখন ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার আগের বছরেও সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। গান্ধি এবং দ(ণপন্থীরা যখন সংযমের আহ্বান জানাচ্ছেন, তখন সমস্ত বামপন্থীরা যুদ্ধ-বিরোধী ও সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে আরও লড়াকু করে তুলতে বলছেন। সি এস পি (CSP) সমেত সব বামপন্থীরা ১৯৩৯ সালে সীতারামাইয়ার সঙ্গে এই নির্বাচনী যুদ্ধে বসুর পাশে এসে দাঁড়ান। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে গান্ধি প্রকাশ্যে সীতারামাইয়াকে তাঁর নিজস্ব প্রার্থী বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধিজি সঙ্গে সঙ্গে একে তাঁর ব্যত্তি(গত মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন এবং সীতারামাইয়ার পরাজয়কে তাঁর নিজের পরাজয় বলে অভিহিত করেন। দ(ণপন্থী গান্ধিবাদীরা পন্থের আনা সেই বিখ্যাত প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁদের আত্র(মণ চালাতে থাকেন। এই প্রস্তাবে পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির উপর আস্থা প্রকাশ করা হয় এবং বসুকে গান্ধির পছন্দমত নতুন কার্য নির্বাহী মনোনীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলাতে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে বসু তখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বাংলাতে বসুর প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস হাই কমান্ডের নির্দেশে প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয় এবং একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়। এর পর শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বসুকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করা হয়। বাংলাতে কংগ্রেস দুইভাগে বিভত্ত(হয়ে যায়। এর পর সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লকের প(জনমত গড়ে তোলার জন্য তাঁর সময় ও শত্তি(ব্যয় করতে থাকেন।

১.৬ সূত্র-নির্দেশ

১। Conpland R. Constitutional Problems in India. London. 1944.

২। Banerji A.C. (ed.). Indian Constitutional Documents. (1757—1947). 4 vols. Calcutta, 1961.

৩। Gwyer and Appadorai (ed.). Speeches and Documents on the Indian Constitution. 2 vols. London. 1957.

৪। Tamilson B. R. Indian National Congress and the Raj (1929—42). London, 1976.

৫। Moore, R. J. Crisis of Indian Unity (1917—40). Oxford, 1974.

১.৭ অনুশীলনী

নমুনা প্রশ্নমালা ঃ

১। দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ভারতে তার কী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের কী উদ্দেশ্য ছিল?

৩। অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন ঃ

১৯৩৭ সালে বেশির ভাগ প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এগারোটির মধ্যে কটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল?

১.৮ সংক্ষিপ্তসার

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কমুন্যাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করেন। এই বাঁটোয়ারাতে তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথা বলে হিন্দুদের বিভক্ত করার চেষ্টা করা হলে তার বিরোধিতা করে গান্ধি আমরণ অনশন শুরু করেন।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভ করে। এর ভিত্তি ছিল (ক) যুক্তরাষ্ট্র এবং (খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এই আইনে তাদের দাবি মানা না হলেও কংগ্রেস এর রূপায়নে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সব রাজনৈতিক দল এই আইনের সমালোচনা করলেও প্রাথমিক কিছু দ্বিধার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ, দুই দলই প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের জন্য ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধীদের বিপুলভাবে পরাজিত করে এবং এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগের প্রদর্শন তেমন আশাব্যঞ্জক হয়নি। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে। তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় ভূমি সংস্কার, হরিজন কল্যাণ, শিক্ষা, দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি ইত্যাদি।